Nishad by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

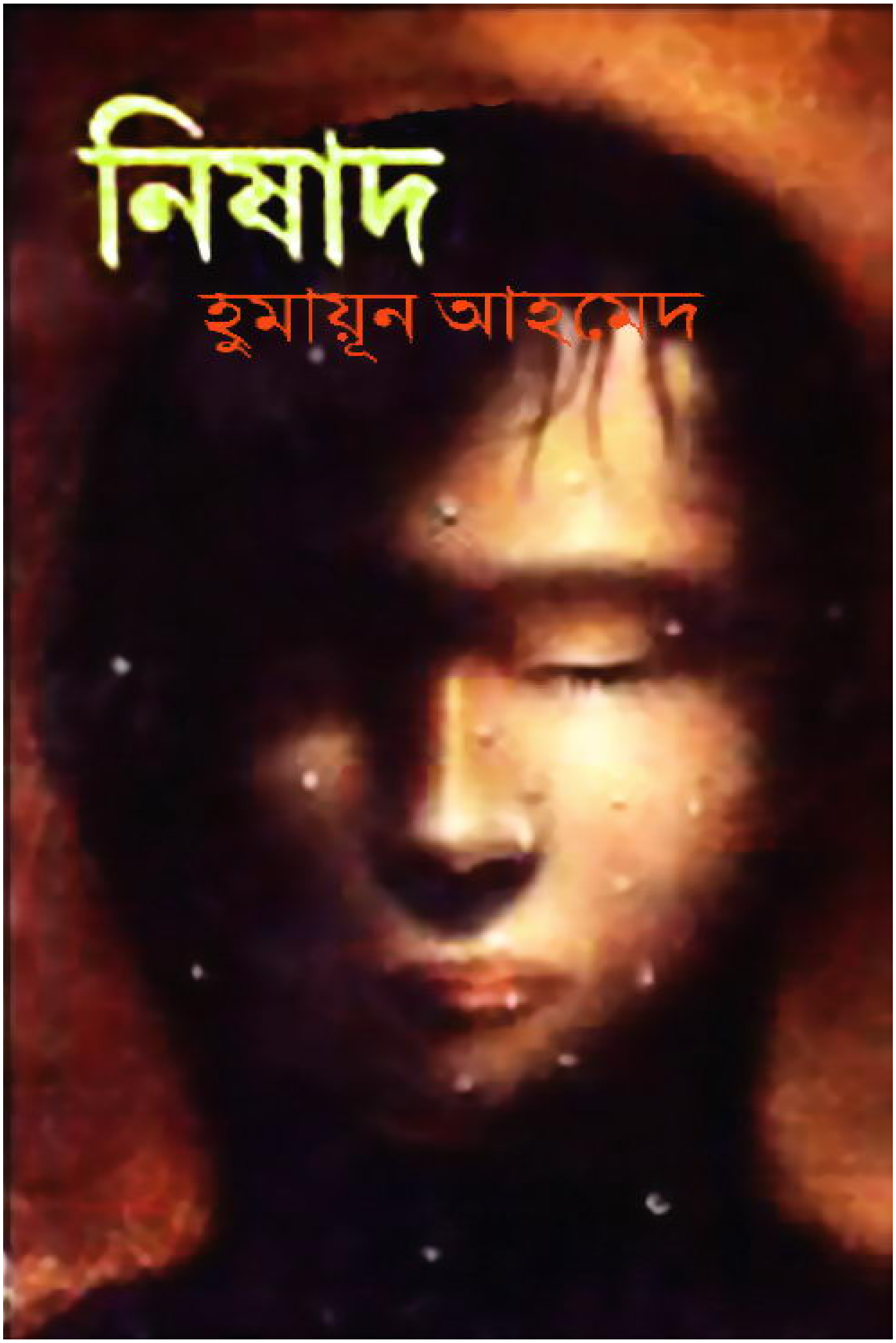
নিষাদ
হুমায়ূন আহমেদ

নিষাদ

১

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছেন। রোগা লম্বা এক জন মানুষ। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ লোকটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গরমেও ফুল হাতা ফ্লানেলের শার্ট, ফুলপ্যান্টটি চকচকে কাপড়ের তৈরী। ছাঁটের ধরন দেখে মনে হয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেট থেকে কেনা। এ ধরনের ছাঁটের প্যান্ট ঢাকায় এখন চালু নেই। পায়ের জুতা জোড়া ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে এখানে আসবার আগে জুতা পালিশ করেছে। মিসির আলি লোকটির বয়স আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন। কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হবার কথা। এই বয়সের যুবকদের চেহারায় এক ধরনের আভা থাকে। যৌবনের আভা। এর তা নেই। অল্প বয়সে চুলও পেকেছে বলে মনে হচ্ছে। কানের পাশে রুপোলি ছোঁয়া। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

সে জবাব দিতে দেরি করছে। যেন এই প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। মিসির আলি আবার বললেন, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'আপনি মনে হয় আগেও কয়েক বার এসেছিলেন?'

'জ্বি।'

'এক বার একটি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন, তাই না? লিখেছিলেন—সোমবার সন্ধ্যায় আসব।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আপনি আসেন নি।'

'একটা কাজ পড়ে গিয়েছিল স্যার।'

লোকটি খুব সহজেই স্যার বলছে। তার মানে ছোট কোনো চাকরি করে। অফিসের প্রায় সবাইকে বোধহয় স্যার বলতে হয়, যে-কারণে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। খারাপ অভ্যাস। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কী করেন?'

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

'সামান্য একটা কাজ করি। বলার মতো কিছু না।'

'আসুন। ভেতরে আসুন।'

'আজ যাই স্যার। আরেক দিন আসব।'

মিসির আলি অত্যন্ত অবাক হলেন। এই লোকটি বারবার তাঁর খোঁজে আসছে, চিঠি লিখে যাচ্ছে। আজ দেখা হল, কিন্তু সে থাকতে চাচ্ছে না। মনের ভেতর বড় রকমের কোনো দ্বিধার ভাব আছে, যা সে কাটাতে পারছে না। মিসির আলি বললেন, 'আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন, চলে যাবেন। কিছুক্ষণ বসে যান। আমার কাছে কেন এসেছেন, সেটা বলুন।'

'অন্য আরেক দিন আসব।'

'সেদিন হয়তো আমাকে পাবেন না। আমি বাসায় খুব কম থাকি। আমার অনেক ঝামেলা।'

লোকটি খুবই অস্বস্তি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। জুতা জোড়া নিয়ে একটু চিন্তা করছে। খুলে ফেলবে কি ফেলবে না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, লোকটি নিজেই বসার ঘরের দরজা বন্ধ করছে। ছিটকিনি লাগানোর চেষ্টা করছে। এটাও হয়তো তার অভ্যাস। সে খুব সম্ভব তার ঘরে ঢুকেই ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। তাই যদি হয়, তাহলে লোকটি থাকে একা। যে বাড়িতে অনেকগুলি মানুষ থাকে, সে-বাড়ির কেউ ঘরে ঢুকেই ছিটকিনি লাগানোর অভ্যাস করবে না।

মিসির আলি বললেন, 'এ-বাড়ির ছিটকিনি লাগানোর একটা বিশেষ কায়দা আছে। আপনি পারবেন না। আপনি বসুন, আমি লাগাচ্ছি।'

লোকটি বসল। বসার ভঙ্গি বিনীত। হাত মুঠি করে কোলের উপর রাখা। ঈষৎ কুঁজো হয়ে বসেছে। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। অতিরিক্ত ফর্সা হবার কারণেই বোধহয় চেহারায় খানিকটা মেয়েলি ভাব চলে এসেছে। অবশ্যি এটা জোড়া ভুরু ও পাতলা ঠোঁটের কারণেও হতে পারে। এই ধরনের ছেলেদেরকেই স্কুলে সবাই 'মেয়ে' বলে খেপায়। এবং উঁচু ক্লাসের কিছু বখা ছেলে বিশেষ কারণে এদের বন্ধুত্ব কামনা করে।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার নাম কি?' লোকটি জবাব দিল না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এখন সে তাকাচ্ছে জানালা দিয়ে। মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'নাম বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'জ্বি-না।'

'তাহলে নাম বলুন। নাম দিয়েই শুরু করা যাক।'

'আমার নাম রইসুদ্দিন।'

'শুধু রইসুদ্দিন! নাকি রইসুদ্দিনের সঙ্গে অন্য কিছু আছে?'

'মোঃ রইসুদ্দিন।'

'দেখুন ভাই, আপনি কিন্তু ঠিক নামটা বলছেন না। মিথ্যা কথা বলায় যারা অভ্যস্ত নয়, তারা যখন মিথ্যা বলে, তখন তাদের গলা কেঁপে যায়। খুব দ্রুত চোখের পাতা পড়ে এবং খানিকটা ব্লাশ করে। আপনার বেলায় এর সব ক'টি হয়েছে।'

'আমার ভালো নাম মুনির। ডাক নাম টুনু।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি স্যার, খাব।'

'আপনি আরাম করে বসুন, আমি চা বানিয়ে আনছি। ঘরে কাজের কোনো লোক নেই। সব আমাকেই করতে হবে। আপনি আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন তা এখন বলবেন? না চা খেয়ে বলবেন?'

'স্যার আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

'বিপদে পড়লে লোকজন যায় পুলিশের কাছে। আমার কাছে কেন? আমি তো পুলিশ নই।'

'অন্য রকম বিপদ। আপনি না শুনলে বুঝবেন না। আগে শুনতে হবে।'

'বেশ শুনছি, তাতে লাভ হবে কি?'

'আপনি অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন--আমি অনেক কিছু আপনার সম্পর্কে শুনেছি।'

'শুনেছেন, খুব ভালো কথা। কী শুনেছেন, জানি না। তবে আপনাকে আগেভাগেই বলে রাখি, আমার দৌড় খুব সামান্য। আমি অ্যাবনরমেল সাইকোলজি নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি--এই পর্যন্তই।'

মুনির মাথা নিচু করে বসে আছে। কোনো কথা সে শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার বাসা কোথায়?'

মুনির তার জবাব দিল না। মাথা নিচু করে ফেলল। অর্থাৎ সে তার ঠিকানা জানাতে ইচ্ছুক নয়। মিসির আলি চা বানাতে গেলেন। ঘরে কোনো খাবার নেই। বিস্কিট-টিস্কিটজাতীয় কিছু দিতে পারলে ভালো হত। লোকটি ক্ষুধার্ত। হয়তো অফিস শেষ করে সরাসরি চলে এসেছে। কিছু খাওয়া হয় নি। কিংবা বিকেলে কিছু খাবার মতো সামর্থ্য নেই। এটি হওয়াই স্বাভাবিক। নিম্ন আয়ের মানুষরা এ-দেশে পশুর জীবন-যাপন করে।

মিসির আলি চা নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে চমকে উঠলেন। কেউ নেই। দরজা ভেজানো। লোকটি এক ফাঁকে উঠে চলে গিয়েছে। নিঃশব্দ প্রস্থান যাকে বলে। মিসির আলি হেসে ফেললেন। এ-জীবনে তিনি অনেক বিচিত্র মানুষ দেখেছেন। তাদের অদ্ভুত আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি পরিচিত। এই লোকটির প্রস্থান ঘটনা হিসেবে তেমন অদ্ভুত নয়, তবু বেশ মজার। তবে নিঃশব্দ প্রস্থানের এই ঘটনার ব্যাখ্যা বেশ সরল। লোকটি যে-বিপদের কথা বলতে এসেছিল, শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছে তা সে বলবে না। এ-রকম মনে করারও অনেকগুলি কারণ হতে পারে। প্রথম কারণ-- সম্ভবত মিসির আলিকে দেখে তার আশাভঙ্গ হয়েছে। মনে হয়েছে, এই লোকটিকে দিয়ে কাজ হবে না। দ্বিতীয় কারণ--বিপদটা এমন শ্রেণীর যা বলার মতো মনের জোর তার নেই।

'স্যার, আসব?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। লোকটি ফিরে এসেছে। তার চোখে-মুখে অপ্রস্তুত ভঙ্গি। যেন সে বড় ধরনের অপরাধ করে এসেছে। এই অপরাধের জন্যে সে লজ্জিত, অনুতপ্ত।

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম। বেশি কিছু দেবার সামর্থ্য স্যার আমার নেই। আমি দরিদ্র মানুষ।'

তিনি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। বেনসন এণ্ড হেজেস, নির্ঘাৎ পঞ্চাশ টাকার মতো খরচ হয়েছে। লোকটি আগের মতো মাথা নিচু করে বসে আছে। চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না।

'আমাকে কী বলতে এসেছেন, বলুন।'

লোকটি কিছু বলল না। মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হালকা স্বরে বললেন, 'যদি বলতে না-চান বলার দরকার নেই। আসুন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করি। গরম কেমন পড়েছে বলুন।'

'খুব গরম পড়েছে স্যার।'

'এই প্রচণ্ড গরমে ফ্লানেলের শার্ট গায়ে দিয়েছেন কেন? আপনার গরম লাগছে না?'

'আমার আর কোনো ভালো শার্ট নেই। আমি দরিদ্র।'

'দরিদ্র হওয়াতে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই। ধনী ব্যক্তিদের বরং লজ্জিত হওয়া উচিত। আপনার চা-টা মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করে আনব?'

'জ্বি-না।'

লোকটি ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। যেন সে একটি অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করছে।

'আপনি কি আমাকে সত্যি সত্যি কিছু বলবেন?'

'জ্বি স্যার, বলব।'

'বলুন।'

মুনির চুপ করে আছে। ইনহিবিশন বলে একটা ব্যাপার আছে। এটা হচ্ছে তাই। প্রথম বাধাটি সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মিসির আলির মনে হল, লোকটি নিঃসঙ্গ প্রকৃতির। একা-একা থাকে। মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস নেই। যা সে বলতে চায়, তা বলার জন্যে তাকে প্রচুর সাহস সঞ্চয় করতে হবে। মিসির আলি তাকে সময় দিলেন।

বাইরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আকাশ থমথমে। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় আসবে সম্ভবত। আসুক। এই গরম আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ইচ্ছা করছে কোনো একটা পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে।

ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালান দরকার। মিসির আলি বাতি জ্বালালেন না। ইনহিবিশন কাটানোর জন্যে অন্ধকার একটা চমৎকার জিনিস।

মুনির মূর্তির মতো বসে আছে। সে এবার ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে কথা বলা শুরু করল। তার গলার স্বর মিষ্টি। শুনতে ভালো লাগে। গলার স্বরে কোথাও যেন একটি ধাতব চরিত্র আছে। মেয়েদের গলার স্বরে তা মানিয়ে যায়। পুরুষদের সঙ্গে ঠিক মানায় না।

২

'আমার ডাক নাম টুনু। আমার একটা ছোট্ট বোন ছিল, ওর নাম ছিল নুটু। টুনু উল্টো

www.Murchona.com

করলে হয় নুটু। বাবা এই নাম রাখলেন। কারণ ওর স্বভাব ছিল আমার একেবারে উল্টো। আমি ছোটবেলা থেকেই খুব শান্ত প্রকৃতির। কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতাম না। কেউ ধমক দিয়ে কিছু বললে সঙ্গে-সঙ্গে কেঁদে ফেলতাম। আর নুটু ছোটবেলা থেকেই হৈচৈ স্বভাবের মেয়ে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া একটা জামগাছ ছিল। নুটু ঐ জামগাছ বেয়ে ছাদে উঠে যেতে পারত। আমাদের বাড়িটা ছিল পুরনো ধরনের, ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি ছিল না। ছাদে কোনো রেলিং ছিল না। বর্ষাকালের ভেজা ছাদে সে দৌড়াত, লাফালাফি করত। কারো কোনো কথা শুনত না। আমার মা এই জন্যে তাকে খুব মারধোর করতেন। তাতে কোনো লাভ হত না। শেষ পর্যন্ত এক বর্ষাকালে আমার মা কাঠমিস্ত্রি লাগিয়ে জামগাছটা কেটে ফেললেন।'

এই পর্যন্ত বলতেই মিসির আলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তো নিতান্তই পারিবারিক গল্প শুরু করেছেন। আপনার যে-সমস্যা, তা তো আমার মনে হচ্ছে বর্তমান সময়ের সমস্যা। শৈশব থেকে শুরু করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। এর কি দরকার আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'বেশ, বলুন।'

আমাদের বাসা ছিল নেত্রকোণায়। বাবা ছিলেন নেত্রকোণা কোর্টের উকিল। তাঁর খুব পসার ছিল। সকালবেলা এবং সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাংলাঘরে মক্কেল বসে থাকত। কেউ-কেউ রাতে থাকত। তাদের জন্যে আলাদা থালাবাটি ছিল, গামছা ছিল, খড়ম ছিল। মামলা করতে মহিলারাও আসতেন। তাঁদের জায়গা হত ভেতরের বাড়িতে। ভেতরের বাড়িতে তাঁদের জন্যেও আলাদা ঘর ছিল।....

'আমরা ভাইবোন বাবার দেখা পেতাম না বললেই হয়। আমাদের সঙ্গে কথা বলার মতো অবসর তাঁর ছিল না। তবে রাতে ঘুমুবার সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে দু' পাশে নিয়ে ঘুমুতেন। অর্ডার দিয়ে বিশাল একটা খাট বানিয়েছিলেন। রেলিংঘেরা খাট। আমরা যাতে গড়িয়ে পড়ে যেতে না পারি সেই ব্যবস্থা। বাবা আমাদের দু' জনের পা তাঁর গায়ের উপর তুলে দিয়ে ঘুমুতেন। তাঁর ঘুমও ছিল খুব সজাগ। আমরা কেউ পা নামিয়ে ফেললে তিনি সেই পা আবার তুলে দিতেন।....

'বাবা খুব খরচে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, আমাদের দু' ভাইবোনের একসঙ্গে আকিকা হয়। আমার বয়স তখন নয়, নুটুর সাত।

'আকিকা উপলক্ষে নেত্রকোণা শহরের প্রায় সবাইকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন। দুপুর বারটা থেকে খাওয়া শুরু হল, চলল রাত বারটা পর্যন্ত। রান্নার জন্য ডেকচি আর বাবুর্চি আনা হয়েছিল ময়মনসিং থেকে। শম্ভুগঞ্জ থেকে এসেছিল হালুইকার। আমার মনে আছে, সারাদিন বাবা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ছোটাছুটি করলেন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের বললেন, মাঘ মাসে গ্রামের বাড়িতেও একটা অনুষ্ঠান করবেন। গ্রামের লোকদের বঞ্চিত করার কোনো মানে হয় না। ওরা মনে কষ্ট পাবে। টাকাপয়সা তো খরচের জন্যেই।....

আকিকা উপলক্ষে আমাদের নাম বদলে গেল। আমার নাম হল মনিরুল ইসলাম চৌধুরী। আর নুটুর নাম হল ফুলেশ্বরী। নাম নিয়ে খুব আপত্তি উঠল। মৌলানা সাহেব বললেন--এটা হিন্দু নাম। হিন্দু নাম রাখা যাবে না।

'বাবা বললেন, ''নামের আবার হিন্দু–মুসলমান কি? এইটা আমার খুব পছন্দের নাম। এই নামই রাখতে হবে। আপনি আপত্তি করলে অন্য কাউকে ডাকি।'' ...

মৌলানা সাহেব আপত্তি করলেন না। আমরা অসংখ্য বিচিত্র ধরনের উপহারের সঙ্গে নতুন নাম পেলাম। উপহার দিয়ে বাংলাঘরের একটা বিশাল চৌকি ভর্তি হয়ে গেল। পেতলের কলসি, ছাতা, কাঁসার বাসন, গায়ের চাদর--এইসব ছিল উপহার। বাবা আকিকার পরপর ঘোষণা করলেন, ''এখন থেকে এদের ডাকনামে কেউ ডাকবে না। যদি কেউ ডাকে কঠিন শাস্তি হবে।'' ...

'আমি ক্লাস নাইনে পড়বার সময় বাবা মারা গেলেন। স্কুল থেকে এসে শুনি বাবা অসুস্থ। সকাল–সকাল কোর্ট থেকে চলে এসেছেন। শুয়ে আছেন তাঁর বিশাল খাটে। মশারি ফেলা। বাবা উহ্ আহ্ করছেন। বাবার মাথার পাশে ঘোমটা দিয়ে মা বসে আছেন। বাবার বন্ধু ইদরিস চাচা বসে আছেন চেয়ারে। তাঁর হাতে পানের বাটা। তিনি একটু পরপর পান মুখে দিচ্ছেন। ইদরিস চাচা বললেন, ''পেটের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাক। এটা হচ্ছে অম্বলের ব্যথা। বদহজম থেকে হয়েছে। নিবারণকে খবর দিয়েছি, এসেই ব্যথা নামিয়ে ফেলবে।'' ...

'নিবারণ হচ্ছেন তখনকার নেত্রকোণার খুব নামী কবিরাজ। তাঁর পসার ছিল সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের চেয়েও অনেক বেশি। নিবারণ কাকা এসে এক চামচ 'আনন্দভৈরব রস' খাইয়ে দিলেন। আনন্দভৈরব রস তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করতে হয়। বিস্তর আয়োজন করে জিনিসপত্র জোগাড় করা হল। হিঙ্গুল এক তোলা, গোলমরিচ এক তোলা, সোহাগা এক তোলা, পিপুল চূর্ণ এক তোলা, জীরকচূর্ণ এক তোলা এবং শোধিত মিঠা বিষ এক তোলা। ...

'আনন্দভৈরব রস' খাওয়াবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবার পেটব্যথা অনেকখানি কমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। ...

'রাত এগারটার দিকে তাঁর ঘুম ভাঙল। তীব্র ব্যথায় তাঁর শরীর কাঁপছে। তিনি কয়েক বার বমিও করলেন। ফুলেশ্বরীকে ডেকে বললেন, ''ওরে বেটি, মরে যাচ্ছি রে। আমার সময় শেষ।'' ...

'এক জন এমবিবিএস ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, ''এটা তো অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। এই মুহূর্তে অপারেশন দরকার।'' ...

'অপারেশন করতে পারেন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। তাও হাসপাতালে সব ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে। সরকারি ডাক্তারের খোঁজে লোকজন ছুটে গেল। তারা ফিরে এল মুখ শুকনো করে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব এক ঘন্টা আগে ময়মনসিং রওনা হয়ে গেছেন। ...

বাবা মারা গেলেন রাত একটা পঁচিশ মিনিটে।" ...

মুনির থামল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'স্যার, এক গ্লাস পানি দিতে পারেন?'

মিসির আলি পানি এনে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মুনির তৃষ্ণার্তের মতো পানির গ্লাসটি শেষ করবে। তা সে করল না। দুই চুমুক দিয়ে রেখে দিল। মুখ বিকৃত করল, যেন তিক্ত স্বাদের কিছু মুখে চলে গিয়েছে।

'স্যার, আমি উঠি?'

'আপনার যা বলার তা কি বলেছেন?'

'জ্বি–না স্যার, ভূমিকাটা বলেছি। এখন মূল জিনিসটা বলতে পারব, তবে আজ না। আজ আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। অন্য এক দিন এসে বাকিটা বলব।'

'ঠিক আছে। এখনি উঠবেন?'

'জ্বি।'

'বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু।'

'অসুবিধা হবে না। আমি খুব কাছেই থাকি।'

'আপনি যাবার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি যে–গল্প বললেন, তার এক জায়গায় আমার একটু খটকা লেগেছে। এই খটকার কারণে আমার ধারণা হচ্ছে গল্পটা বানানো।'

মুনির বিস্মিত হয়ে তাকাল। শীতল গলায় বলল, 'কোথায় খটকা লেগেছে?'

'আপনি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন আপনার বাবা মারা যান। তার মানে আপনি নিতান্তই বাচ্চা একটি ছেলে। ঘটনাগুলি আপনি ঘটতে দেখেছেন এই পর্যন্তই। অথচ কবিরাজ নিবারণের 'আনন্দভৈরব রস' কিভাবে তৈরি হল তার নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। হিংটুল এক তোলা, গোল মরিচ এক তোলা, সোহাগা এক তোলা .... ইত্যাদি। এসব তো আপনার জানার কথা নয়। এক জন কবিরাজ তাঁর ওষুধ তৈরিতে কি কি অনুপান ব্যবহার করেন তা বলেন না। আর বললেও ক্লাস নাইনের একটি ছেলে তা মুখস্থ করে রাখে না। কাজেই আমার ধারণা, গল্পের এই অংশটি বানানো। একটা অংশ যদি বানান হয়, অন্য অংশগুলিও কেন হবে না?'

মুনির ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবার মৃত্যুর পর সবার ধারণা হয়েছিল, কবিরাজ নিবারণ কাকুর অষুধ খেয়ে এটা হয়েছে। সবাই নিবারণ কাকুকে চেপে ধরল। তিনি অসংখ্যবার বললেন কোন কোন অনুপান দিয়ে তাঁর এই অষুধটি তৈরি হয়েছে। সেই জন্যেই নামগুলি মনে গেঁথে আছে। এখন কি আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমি সত্যি কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে।'

'তা ছাড়া মিথ্যা কথা বললে আমার গলার স্বর কেঁপে যেত। চোখের পাতা দ্রুত পড়তে থাকত। কিছুটা ব্লাশ করতাম। তা কি করেছি?'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসতে–হাসতেই বললেন, 'আপনার কথা শুনেছি অন্ধকারে। কাজেই চোখের পাতা দ্রুত পড়ছে কি না, ব্লাশ করছেন কি না—তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তবে গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছিল বারবার। তা হচ্ছিল আবেগজনিত কারণে।'

মুনির বলল, 'আপনি স্যার আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনি আমার বাবার বয়েসী। আমাকে ''আপনি'' করে বললে খুব খারাপ লাগবে।'

'বেশ, এখন থেকে তাই বলব। তুমি একটা ছাতা নিয়ে নাও। ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে।

'ছাতা লাগবে না।'

মুনির বৃষ্টির মধ্যেই নেমে গেল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। বৃষ্টির মধ্যে সবাই সাধারণত একটু দ্রুত হাঁটে। সে তাও করছে না। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছে।

মিসির আলি ছেলেটির প্রতি তীব্র কৌতূহল অনুভব করলেন।

৩

মিসির আলি ভেবেছিলেন পরদিনই আবার আসবে। সন্ধ্যাবেলা তাঁর একটা বিয়ের দাওয়াত ছিল। সেখানে গেলেন না। কিছু খাবার আনিয়ে রাখলেন। অভুক্ত একটি মানুষকে শুধু এক কাপ চা যেন দিতে না হয়।

সে এল না। তার পরদিনও না। দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। ছেলেটির তাঁর কাছে না আসার কোনো কারণ নেই। সে জরুরি কিছু বলতে চায়। তাঁর এক জন ভালো শ্রোতা দরকার। ভালো শ্রোতার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, এবং প্রমাণও করেছেন যে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

তিনি ছেলেটির গল্প নিয়েও বেশ চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ছেলেটি বেশ চমৎকার ভঙ্গিতে স্মৃতিচারণা করেছে। কিন্তু এক জনকে বাদ দিয়ে। সে তার মা সম্পর্কে কিছুই বলে নি। ভদ্রমহিলা জামগাছটা কাটিয়ে ফেলেছেন, এইটুকুই শুধু বলা হয়েছে। এর বেশি নয়।

মা সম্পর্কে তার অস্বাভাবিক নীরবতার কারণ কী হতে পারে? একমাত্র কারণ, মাকে সে পছন্দ করেছে। না। স্মৃতিকথা বলবার সময় যাকে আমরা পছন্দ করি না, তার সম্পর্কে কটু কথা বলি। এই ছেলে তাও করছে না। কারণ মাকে সে এককালে পছন্দ করত, এখন করছে না। কেন করছে না, সেই সম্পর্কেও মিসির আলি অনেক ভাবলেন। মোটামুটিভাবে একটা ঘটনা সাজালেন। ঘটনা এ-রকম দাঁড়াল--

উকিল সাহেবের মৃত্যুর পর খুব সম্ভব এই পরিবারটি গভীর সমুদ্রে পড়ল। দেখা গেল উকিল সাহেব তাঁর জীবনে আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি করেছেন। শহরে তাঁর প্রচুর দেনা। তাঁর আত্মীয়স্বজন, যারা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় বিশেষ পাত্তা পায় নি তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে বিশেষ চিন্তাযুক্ত মনে হতে লাগল।

উকিল সাহেবের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, কারণ ছেলেটি সুন্দর। মেয়েটি নিশ্চয়ই সুন্দরী, কারণ তার বাবা খুব আগ্রহ করে মেয়ের নাম রেখেছে ফুলেশ্বরী। যাই হোক, অত্যন্ত রূপবতী এক জন মহিলার জন্যে অনেকেরই আগ্রহ দেখা গেল। তেমনই এক জনকে ভদ্রমহিলা বিয়ে করে ফেললেন।

ছেলেটি এ কারণেই মায়ের সম্পর্কে নীরব। জিজ্ঞেস না করলে সে হয়তো তার মার দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কিছুই বলবে না।

মিসির আলি ছেলেটিকে নিয়েও ভাবলেন। একটা নিঃসঙ্গ ভাবুক ধরনের ছেলে, যার উপর অনেক ঝড়ঝাপ্টা গিয়েছে এবং এখনো যাচ্ছে। ছেলেটি বুদ্ধিমান। বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে। তবে তিনি তাঁর মূল সমস্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারলেন না। পারিবারিক জটিলতা নিশ্চয়ই তার সমস্যা নয়। সমস্যার ধরন এবং

www.Murchona.com

প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভিন্ন। সেটা কী হতে পারে? মিসির আলি কোনো কিনারা করতে পারলেন না। একমাত্র পথ হচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলা। সেই সুযোগ হচ্ছে না। মুনির আসছে না।

মিসির আলি আশেপাশে খানিকটা খোঁজখবরও করলেন। মেসজাতীয় বাড়ি আছে কি না। ছেলেটি নিশ্চয়ই বাড়ি ভাড়া করে থাকে না। মেসেটেসেই থাকে। একটা মেস পাওয়া গেল--স্টার মেস। সেখানে মুনির নামের কেউ থাকে না। দুটো সস্তার হোটেলেও তিনি খোঁজ করলেন। মুনির নামের কোনো ছেলের সন্ধান কেউ দিতে পারল না।

ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলের ঠিকানা জোগাড় করে টেলিফোনে মুনিরের খবর জানতে চেষ্টা করলেন। তারা বলল, মুনির নামের কেউ এখানে কাজ করে না। মুনির কি মিথ্যা ঠিকানা দিল?

প্রতিটি কথাই কি তার মিথ্যা? পুরোপুরি সত্যি বলা যেমন কঠিন, আবার পুরোপুরি মিথ্যা বলাও কঠিন। এই কঠিন কর্ম মুনির, মনে হচ্ছে, বেশ সহজভাবেই করছে।

মিসির আলি বিরক্তি-মেশান কৌতূহল নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। মুনির আর এল না। বেশ ক'টা মাস কেটে গেল।

৪

আষাঢ় মাস। জলবায়ুর নিয়মকানুন পাল্টে গেছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। সারাদিন ঝাঁঝা রোদ থাকে। রাতে ভ্যাপসা গরম। জীবন অতিষ্ঠ।

আজ এই প্রথম বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব দেখা দিয়েছে। আকাশ মেঘলা। রাজ্যের ব্যাঙ গলা ফুলিয়ে ডাকাডাকি করছে--তাদের উৎসাহ দেখে মনে হয় বৃষ্টি নামতে দেরি নেই।

মিসির আলি কমলাপুরে তাঁর ভাগ্নীর বাড়িতে যাবেন বলে তৈরি হয়ে বসে আছেন। ব্যাঙের ডাক শুনে বেরুতে ভরসা পাচ্ছেন না। সঙ্গে ছাতা নেই--বৃষ্টি নামলে যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হবে।

অবশ্যি বৃষ্টি যে হবেই, এ-রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গ আবহাওয়ার খোঁজখবর ভালো রাখলেও আজকাল তারাও ভুল করছে।

তবে আজ বোধহয় ভুল করে নি। আকাশ ক্রমেই কালিবর্ণ হচ্ছে। বাতাস ছাড়তে শুরু করেছে। একমাত্র ভয়, বাতাস বোধহয় মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

'স্যার, আসব?'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। মুনির এসেছে। নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তার চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় নি। তবে খানিকটা রোগা হয়েছে। চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। চোখের নিচে কালি পড়েছে। ঘুমের অসুবিধা হলে এ-রকম হয়। ছেলেটি আবার বলল, 'স্যার, আসব?'

'এসেই তো পড়েছ, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'না পারার তো কোনো কারণ দেখছি না। তোমার নাম মুনির। ডাকনাম টুনু।

তোমার ছোট বোনের নাম নুটু, ভালো নাম ফুলেশ্বরী।'

মুনির হেসে ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'আমি ধরে নিয়েছিলাম তুমি আর আসবে না। প্রথম এসেছিলে চৈত্র মাসের কুড়ি তারিখে, আজ আষাঢ়ের তৃতীয় দিন। মাঝখানে ক'টা মাস চলে গেছে।'

মুনির জবাব দিল না। টেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেটটা রাখল। আজও সে বিদেশি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসেছে। মিসির আলি প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট কেন আনা হল? কী প্রয়োজন ছিল এ-জাতীয় সৌজন্যমূলক কথাবার্তায় গেলেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হল এতক্ষণ তিনি মুনিরের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

'আজও অন্ধকারে কথা বলবে, না বাতি জ্বালানো থাকবে?'

'বাতি থাকুক।'

'এতদিন আস নি কেন?'

'ইচ্ছে হয় নি।'

'আজ আবার ইচ্ছে হল?'

'জ্বি স্যার।'

'খুব ভালো। চা খাবে?'

'জ্বি–না।'

'শুরু কর তাহলে।'

ছেলেটিকে আজ বেশ সুন্দর লাগছে। কেন লাগছে, তা মিসির আলি ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। ফ্লানেলের শার্টের বদলে আজ তার গায়ে হালকা নীল রঙের একটা হাওয়াই শার্ট। শার্টটায় ছেলেটিকে খুব মানিয়েছে। এবং যে-কোনো কারণেই হোক, আজ তার মধ্যে দ্বিধার ভাব একেবারেই নেই। আচার-আচরণ অত্যন্ত সহজ।

'মুনির।'

'জ্বি!'

'বসে আছ কেন? আরম্ভ কর।'

মুনির সঙ্গে-সঙ্গে শুরু করল না। প্রথম দিনের মতো মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটির মধ্যে দ্বিধার কোনো ভাব নেই, তবু সে দেরি করছে। তার বক্তব্য হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছে। এর অর্থ একটাই। ছেলেটির বক্তব্য খুব জোরাল নয়। গুছিয়ে নেবার প্রয়োজন আছে।

মুনির নিচু গলায় কথা বলা শুরু করল।

'প্রথম রাতে আপনাকে আমার বাবার মৃত্যুর কথা বলেছি। সেটা বার বছর আগেকার কথা। এই বার বছরে অনেক কিছুই হল। বাবার সংসার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁর প্রচুর দেনা। যে-জমির উপর বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেই জমির দামও তিনি পুরো দেন নি।

'আমাদের আত্মীয়স্বজনরা প্রথম দিকে আমাদের দেখাশোনার জন্যে অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ততা দেখালেন। ফুলেশ্বরীর বিয়ে দিয়ে দিলেন মাত্র তের বছর বয়সে। যুক্তি দিলেন--ফুলেশ্বরীর বর সংসারের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেবে। ঝড়ঝাপ্টা সামাল দেবে।

ফুলেশ্বরী খুব কাঁদল। কেউ তার কোনো কথা শুনল না। এক ধনী ব্যবসায়ীর

অপদার্থ জড়বুদ্ধি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হল।'

মুনির দম নেবার জন্যে থামতেই মিসির আলি বললেন, 'তোমার মার প্রসঙ্গে তো তুমি কিছু বলছ না। উনি কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন?'

'জ্বি–না। বাবার মৃত্যুর দু' বছরের মাথায় মা মারা যান।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি মার দ্বিতীয় বার বিয়ের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?'

'এম্নি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নেই!'

বলেই মিসির আলি একটু লজ্জা পেলেন। কারণ ছাড়া এই পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। অথচ তিনি কারণের ব্যাপারটি অস্বীকার করলেন।

'তারপর কি হল বল।'

'এই সময় আমার বাড়ি–পালানর রোগ হল। টাকাপয়সা কিছু জোগাড় করতে পারলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। টাকাপয়সা শেষ হলে আবার ফিরে আসতাম।…

'বাড়ি–পালানর কারণে নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশবার আমার সুযোগ হয়েছে। কিছু–কিছু অভিজ্ঞতা খুবই সুন্দর, আবার কিছু অভিজ্ঞতা ভয়ংকর কুৎসিত। কিছুদিন একটা যাত্রাদলের সঙ্গে ছিলাম। আমার চেহারা তখন খুব সুন্দর ছিল। এই চেহারা সম্বল করে একটি নারী–চরিত্রে অভিনয় করতাম, যদিও সেই যাত্রাদলে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার—মেয়েদের সাজপোশাক পরা আমার অভ্যাস হয়ে গেল। যখন অভিনয় থাকত না, তখনও শাড়ি–ব্লাউজ পরে থাকতাম। ঠোঁটে লিপস্টিক দিতাম। রাতে ঘুমুতাম ঐ মেয়েগুলির সঙ্গে এক ঘরে। তাতে ঐ মেয়েরা বেশ মজা পেত। ···

'যাত্রাদলের পুরুষদের অনেকেই এইসব মেয়েদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওরা আমাকেও কামনা করত।'

'তুমি ক' দিন ছিলে ওদের সঙ্গে?'

'প্রায় দু' বছর।'

'চলে এলে কেন?'

'একটা ভুল তো মানুষ দীর্ঘদিন করতে পারে না। এক সময়–না–এক সময় তার জ্ঞান হয়। সে বুঝতে পারে।'

'তা ঠিক। তারপর বল।'

'ভূমিকা আমি প্রায় শেষ করে এনেছি। এখন আমি বর্তমান অবস্থাটা একটু বলেই কি জন্যে আপনার কাছে এসেছি তা বলব। ···

'আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে টাইপিস্টের চাকরি করি। থাকি একটা বাসায়। বিনিময়ে এদের কিছু কাজকর্ম করে দিই। ওদের ছোট বাচ্চাদের রাতের বেলা পড়াই। থাকা এবং খাওয়া আমার এইভাবেই চলে। ঘুমাই তিনতলার একটি খুপরি ঘরে। তিনতলা পুরোপুরি তৈরি হয় নি। দুটো ঘর ওঠার পর বাড়িওয়ালা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘর দুটোতে ছাদ নেই। কারণ পুরোটা তৈরি হলে ছাদ ঢালাই হবে। উপরে টিন দিয়ে ছাদের কাজ চলছে। একটি ঘরে আমি থাকি, অন্য ঘরটিতে বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম, সিমেন্টের বস্তা, রড এইসব। এই ঘরটি থাকে

তালাবন্ধ। ···

'ছাদের ঘর দুটোতে বাথরুমের কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজেই বাথরুমের প্রয়োজন হলে আমাকে যেতে হয় একতলার সার্ভেন্টস বাথরুমে। ঐ বাড়িতে এই সামান্য সমস্যা ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা আমার ছিল না। বলা যেতে পারে আমি খুব সুখেই ছিলাম। ···

'বেতনের টাকার কিছুটা জমাই, কিছু পাঠাই আমার বোন ফুলেশ্বরীকে। বিএ ক্লাসের বইপত্র জোগাড় করেছি। এখন একটা কলেজে নাম লিখিয়েছি, যেখানে ক্লাস না করলে অসুবিধা হবে না। যথাসময়ে বিএ পরীক্ষার্থী হিসেবে নিয়মিত পরীক্ষায় বসা যাবে।'

'তুমি তা হলে আইএ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছ?'

'জ্বি স্যার। যাত্রাদল থেকে বের হয়ে এসে আমার বড়চাচার বাড়িতে চলে যাই। ম্যাট্রিক এবং আইএ তাঁর কাছে থেকেই পাস করি। উনি খুবই দরিদ্র মানুষ। আমাকে আর পড়ানর সামর্থ্য তাঁর ছিল না।'

'তোমার রেজাল্ট কেমন হয়েছিল?'

'খুবই ভালো। চারটা লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করি। আইএতে মেরিট স্কলারশিপ পাই। ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইলে আমার চাকরি হয় আমার রেজাল্টের জন্যে। তখন আমি টাইপিং জানতাম না। অথচ আমাকে টাইপিষ্টের পোষ্টে নেয়া হয়। অন্য পোষ্ট খালি ছিল না।'

'তারপর বল।'

মুনির চুপ করে রইল! মিসির আলি বললেন, 'একটা ইন্টারভ্যাল হলে কেমন হয়। এস, এক কাপ চা খেয়ে তারপর শুরু করি।

'জ্বি আচ্ছা।'

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে? ভালো কেক আছে।'

'আমি শুধু চা-ই খাব।'

মিসির আলি চা নিয়ে এসে দেখলেন ঘরের বাতি নেভান। মুনির অন্ধকারে বসে আছে। মিসির আলি কিছু বললেন না। চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন।

মুনির নিঃশব্দে চায়ের কাপ শেষ করে কথা বলতে শুরু করল—

'ঘটনাটা ঘটল এক বছর আগে ভাদ্র মাসে। আমার অনিদ্রা রোগ আছে, বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমুতে পারি না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়। যে-রাতের কথা বলছি, সে-রাতে অসহ্য গরম পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ ছাদে হাঁটাহাঁটি করলাম। ছাদও তেতে আছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই। একটা ভেজা গামছা গায়ে জড়িয়ে রাত একটা পর্যন্ত ছাদের রেলিং-এ বসে রইলাম। তখন একটু ঝিমুনির মতো ধরল। বিছানায় এসে শুয়েছি। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছি, হঠাৎ পাশের ঘরে শব্দ হতে লাগল। আমি বেশ অবাকই হলাম, কারণ পাশের ঘর তালাবন্ধ। আমার ঘর থেকে পাশের ঘরে যাওয়ার একটা দরজা আছে, কিন্তু সেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। প্রথম ভাবলাম ইঁদুর কিংবা বেড়াল। কিন্তু শব্দ শুনে মনে হচ্ছে না ইঁদুর-বেড়ালের শব্দ। যেন অনেক মানুষ ঘরের মধ্যে আটক। তাদের ফিসফাস কথা কিছু-কিছু শোনা যাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। মৃদু হাসিও শুনলাম। যেন অনেকে দরজায় আড়ি পেতেছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখছে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি বললাম--কে? সঙ্গে–সঙ্গে সব শব্দ থেমে গেল। চারদিক আগের মতো নীরব। আমি উঠে বসলাম। ঘর অন্ধকার। আমি কৌতূহল মেটাবার জন্যেই পাশের ঘরের দরজায় হাত রাখলাম। দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে আবছা আলো। সেই আলোয় ঝাপসাভাবে সবকিছু চোখে পড়ে, আবার অনেক কিছু চোখেও পড়ে না। আমি ঘরের ভেতর ঢুকলাম, তখনি নিচে নামার একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার, ঘরের ভেতর সিঁড়ি আসবে কেন! অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমি পরিষ্কার কিছু চিন্তা করতে পারছি না। সব কেমন জট পাকিয়ে গেছে। যেমন আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। গা কাঁপিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসার আগে যেমন ঘোর লেগে থাকে, ঠিক সে–রকম। নিজেই বুঝতে পারছি না যে, আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছি। সব–শেষ সিঁড়িটা পার হবার পর আমার ঘোর কেটে গেল। আমি পুরোপুরি এক জন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ। তবে এই সময়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে, কারণ আমি আর সেই আমি নই। আমি ঢাকা শহরেও নেই। আমি আছি আমাদের নেত্রকোণার ঐ বাড়িটিতে। সবে স্কুল থেকে ফিরছি। ফুলেশ্বরী আমাকে বলছে' 'টুনু, বাবার শরীর খুব খারাপ। কোর্ট থেকে সকাল–সকাল চলে এসেছেন। বাবার পেটে ব্যথা। ···

'আমার গা ঝনঝন করতে লাগল। চোখের সামনে যে–দৃশ্য দেখছি--সে দৃশ্য আমার অতীত জীবনের। আবার তা ফিরে এসেছে কী করে? তাহলে কি আমার বয়স বাড়ে নি? এতদিন যা ঘটেছে সবই কল্পনা কিংবা দীর্ঘ কোনো স্বপ্ন! ···

'আমি শোবার ঘরে উঁকি দিলাম। বাবা রেলিং–দেয়া খাটে শুয়ে আছেন, মশারি ফেলা। মা বসে আছেন বাবার মাথার পাশে।···

'ইদরিস চাচা পানের বাটা হাতে বসে আছেন। আমি অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছি। কারণ এরপর কি হবে আমি জানি। ইদরিস চাচা বলবেন' ''পেটের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাক। এটা হচ্ছে অম্বলের ব্যথা। নিবারণকে খবর দিয়েছি, এসেই ব্যথা নামিয়ে ফেলবে।'' ···

'সত্যি–সত্যি ইদরিস চাচা এই কথাগুলিই বললেন। আমি চমকে উঠলাম। পরবর্তী প্রতিটি ঘটনা কি হবে আমি জানি। আমি যেহেতু জানি, সেহেতু এই ঘটনাগুলি ঘটতে দেয়া যাবে না। নিবারণ কাকু আসবার আগেই নিয়ে আসতে হবে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবকে, যেন তিনি আজ কিছুতেই রাত দশটার ট্রেনে ময়মনসিং যেতে না পারেন।' ···

'আমি কাউকে কিছু না বলে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের বাসার দিকে ছুটলাম। ডাক্তার সাহেবকে বাবার অসুখের কথা বলাতেই তিনি সঙ্গে–সঙ্গে এলেন। বাসায় এসে দেখি নিবারণ কাকু এসেছেন। হামানদিস্তায় কিছু যেন গুঁড়ো করা হচ্ছে। ···

'ডাক্তার সাহেবকে দেখে বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আপনাকে আবার কে খবর দিল?'' ···

''আপনার ছেলে। বাবার অসুখের কথা বলতে–বলতে ছেলের চোখে দেখি পানি। আপনার ছেলে বোধহয় আপনাকে খুব ভালোবাসে। দেখি, আপনার পেটটা দেখি।'' ·

''কিচ্ছু দেখতে হবে না। বদহজম থেকে হয়েছে। নিবারণদা এসেছেন, অষুধ তৈরি

হচ্ছে। খাওয়ামাত্র আরাম না হলে নিবারণদা নাকি তার কবিরাজী ছেড়ে দেবেন।'' · ·

'ডাক্তার সাহেব বাবার কথায় কোনোই কান দিলেন না। টিপেটুপে বাবার পেট দেখলেন। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, ''আপনার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস তো পেকে টসটস করছে। এক্ষণি কেটে ফেলতে হবে।'' · · ·

'বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কি বলছেন এ-সব!'· · ·

''যেটা সত্যি সেটাই বলছি। আশা করি আপনি বেঁচে থাকতে চান? বেঁচে থাকতে না চাইলে ভিন্ন কথা।'' · · ·

''সত্যি বলছেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস?'' · · ·

''হ্যাঁ, সত্যি। রাত দশটার ট্রেনে ময়মনসিং যাবার কথা ছিল, সেটা আর হতে দিলেন না।'' · · ·

'ডাক্তার সাহেব খসখস করে একটা কাগজে কী সব লিখলেন। আমার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ''খোকা তুমি এই চিঠিটা ডাক্তার মিহিরবাবুকে দিয়ে এস। তাঁরও হেল্প লাগবে। মিহিরবাবুর বাসা চেন তো? মেয়েদের স্কুলের সামনে একতলা বাড়ি। যাও ছুটে যাও। এই তো গুড বয়!'' · · ·

'আমি কাগজ হাতে নিয়ে উল্কার মতো ছুটলাম। ঘর থেকে বেরুতেই কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলাম। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। মুহূর্তের জন্যে চারদিক অন্ধকার। অন্ধকার কিছুটা কাটতেই দেখি আমি আবার আগের জায়গায় ঢাকা শহরের তিনতলার আমার ছোট্ট খুপরিতে। ভাদ্র মাসের অসহ্য গরমে আমার গা ঘামছে। ঘর অন্ধকার হলেও রাস্তার কিছু আলো এসেছে। সেই আলোয় দেখলাম পাশের ঘরের দরজা আগের মতোই বন্ধ।'

মুনির চুপ করল। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'এটাই তোমার সেই বিশেষ কথা?'

'জ্বি স্যার।'

'আর কিছু বলতে চাও না?'

'আর কিছু বলার নেই।'

'তুমি যা দেখেছ, তার ব্যাখ্যা কি খুবই সহজ নয়?'

'জ্বি, সহজ। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'হ্যাঁ--স্বপ্ন।'

'স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল খুব অল্প হয়। কিন্তু অল্প সময়েই অনেক কিছু বলে। আইনস্টাইনের টাইম ডাইলেশনের ব্যাপার। থিওরি অব রিলেটিভিটির অন্য এক ধরনের প্রয়োগ। তাই না?'

'হতে পারে, থিওরি অব রিলেটিভিটি আমার জানা নেই।'

'আমিও জানি না। ভাসা-ভাসা যা শুনি তাই বললাম।'

'তুমি যে-স্বপ্ন দেখেছ এটা হচ্ছে এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ স্বপ্ন। তোমার অবচেতন মনে আছে তোমার বাবাকে বাঁচিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা। অবচেতন মনের ইচ্ছাগুলিও স্বপ্নে ধরা দিয়েছে। সব সময় তা হয়। এ-জীবনে যে-সব জিনিস আমরা পাই না, অথচ যে-সব জিনিসের জন্যে গভীর কামনা বোধ করি--স্বপ্নে তাদের পাই। তাই না?'

'জ্বি স্যার, তাই।'

বলেই মুনির উঠে দাঁড়াল।

'রাত হয়ে গেছে, আজ উঠি স্যার।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মুনিরের মুখ থমথম করছে। চোখের দৃষ্টি অন্য রকম। যেন এই মুহূর্তে সে কোনো–একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

'মুনির।'

'জ্বি?'

'তোমার বোধহয় আরো কিছু বলার ছিল। শুধু স্বপ্নের কথা বলার জন্যে আমার কাছে আস নি।'

মুনির শীতল গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। এতটা নির্বোধ আমি না। সামান্য একটা স্বপ্ন নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব কেন?'

'বল সেটা কি?'

'আপনাকে তো বলেছি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব আমার হাতে একটা চিঠি লিখে দিলেন মিহির বাবুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। ঐ চিঠি নিয়ে বেরুবার সময় আমি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই।'

'হ্যাঁ, তখন তোমার স্বপ্ন ভেঙে যায়।'

'জ্বি স্যার। এবং আমি দেখি চিঠিটা আমার হাতে তখনো আছে।'

'কী বলছ তুমি!'

'আমি চিঠিটা আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।'

মিসির আলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মুনির চিঠিটা টেবিলের উপর রাখল। মৃদু স্বরে বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।'

'তুমি যে কত বড় একটা অসম্ভব কথা বলছ, তা কি তুমি জান?'

'জানি স্যার।'

মুনির বেরিয়ে গেল। মিসির আলি চিঠি হাতে নিলেন। তাঁর কপালে বিন্দু–বিন্দু ঘাম।

ছেলেটি যা বলছে, সবই কি বিশ্বাসযোগ্য? নিশ্চয়ই না। সে চমৎকার গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে চাকরির ব্যাপারটা মিথ্যা। তিনি খোঁজ নিয়েছেন। এই মিথ্যাটা সে হয়তো নিজেকে আড়াল করবার জন্যে বলছে। মূল ঘটনা হয়তো সত্যি। কিন্তু তা কী করে হয়!

৫

প্যাডে ডাক্তার সাহেবের নাম লেখা। এ মল্লিক এমবিবিএস (আপার) মেডিকেল অফিসার, নেত্রকোণা সদর। কোনো তারিখ নেই। চিঠি লেখা হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে। মিহিরবাবুর নাম ইংরেজিতে। বাকি অংশ বাংলায়।

মিহিরবাবু,

জরুরিভিত্তিতে একটা অপারেশন করতে হচ্ছে। কামরুদ্দিন সাহেবের অ্যাপনডিক্স।

প্রায় র‍্যাপচারের পর্যায়ে। আপনার সাহায্য প্রয়োজন। হাসপাতালে চলে আসুন। হাসপাতালে অপারেশনের সরঞ্জাম অপ্রতুল। তবু করতে হবে। এই উকিল সাহেবের কাছে আমি নানান বিষয়ে ঋণী।

বিনীত
এ মল্লিক

এই চিঠি মিসির আলি খুব কম করেও পঞ্চাশ বার পড়েছেন। তাতে নতুন কোনো তথ্য বের হয়ে আসে নি। যিনি এই চিঠি লিখেছেন, তাঁর চরিত্র সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের বেশি কথা বলার অভ্যাস আছে। জরুরি অবস্থায় তিনি চিঠি লিখছেন, তবু সেখানেও কিছু ফালতু কথা আছে, যেমন--"এই উকিল সাহেবের কাছে আমি নানান বিষয়ে ঋণী।" সঙ্কটের সময়ে আমরা শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যই দিই, অপ্রয়োজনীয় তথ্য দিই না। ইনি দিচ্ছেন। যে-জন্যে ক্ষীণ সন্দেহ হয়, চিঠিটা হয়তো ডাক্তার সাহেবের লেখা নয়।

মুনির একটা প্যাড জোগাড় করে নিজেই লিখেছে কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। এখন কথা হল, এটা সে কেন করবে? তার মোটিভ কি?

ঘটনাটা যদি বিদেশে ঘটত, তাহলে একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যেত। পাবলিসিটি। পত্রিকায় ছাপা হত। টিভি প্রোগ্রাম হত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে, তদন্তকারী টীম বসত। এক দল বলত পুরোটাই ভাঁওতা, অন্য দল বলত, না, ভাঁওতা নয়--ব্যাপারটার মধ্যে কিছু-একটা আছে।

আমেরিকায় কানসাস সিটির এক মহিলাকে নিয়ে এ-রকম হল। ভদ্রমহিলা সেইন্ট পল স্কুলের গেম টীচার। একবার এক সপ্তাহ স্কুলে এলেন না। এক সপ্তাহ পার করে যখন এলেন তখন তাঁর চোখ-মুখ শুকিয়ে আমসি। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। ডাকলে সাড়া দেন না। দু' বার-তিন বার ডাকতে হয়। ভদ্রমহিলা এক অদ্ভুত গল্প বললেন। তার মৃতা মা নাকি এক দুপুরবেলা হঠাৎ তাঁর বাসায় উপস্থিত। স্বাভাবিক মানুষের মতো গল্প শুরু করলেন। লাঞ্চে কি আছে জিজ্ঞেস করে শাওয়ার নিতে গেলেন। তিনি দু' দিন থাকলেন। স্বাভাবিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করলেন। ঘুমুলেন। প্রচুর গল্প করলেন। তবে বাড়ি থেকে বেরুলেন না এবং নিজের মেয়েকেও বেরুতে দিলেন না। বেশির ভাগ গল্পই পরকালসংক্রান্ত। কিছু-কিছু উপদেশও দিলেন। বিশেষ কোনো উপদেশ নয়। ধর্মগ্রন্থে যে-ধরনের উপদেশ থাকে, সে-ধরনের উপদেশ। তারপর এক দিন ভরদুপুরে যেভাবে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই চলে গেলেন।

স্কুল শিক্ষিকার এই ঘটনা নিয়ে সারা আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে গেল। ভদ্রমহিলা লাই ডিটেকটর টেস্ট দিলেন। দেখা গেল তিনি সত্যি কথাই বলছেন। এক দল বলা শুরু করল—লাই ডিটেকটর টেস্ট মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভদ্রমহিলা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। ভদ্রমহিলা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নাকি ব্যাধিগ্রস্ত নন তা বের করার জন্যে আবার বিশেষজ্ঞদের টীম বসল। হুলস্থূল ব্যাপার!

৬

মুনিরের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তবে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের কারণেও সে এটা করতে পারে। হয়ত সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসগুলো তার পছন্দ নয়। তার অপছন্দের ব্যাপারগুলো সে অন্যদের জানাতে চায়। মিসির আলিকে দিয়ে তার শুরু। পরে অন্যদের কাছে যাবে।

মিসির আলি ঠিক করলেন, যে করেই হোক, ডাক্তার এ মল্লিককে খুঁজে বের করবেন। তাঁকে এই চিঠিটি দেখাবেন। এতে রহস্যের অনেকটা সমাধান হবার কথা। ডাক্তার এ মল্লিককে খুঁজে বের করতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। যেহেতু সরকারি ডাক্তার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলতে পারবে উনি কোথায় আছেন, কোন পোস্টে আছেন। নিশ্চয়ই তাদের ডাইরেক্টরেট আছে।

বাংলাদেশে কোনো কাজই সহজে হয় না। ডাক্তার এ মল্লিকের খোঁজ বের করতে তাঁকে বিস্তর ঝাঁমেলা করতে হল। এ বলে ওর কাছে যান, ও বলে আজ না, সোমবারে আসুন। সোমবারে গিয়ে দেখেন, যিনি খবর দেবেন তিনি শালার বিয়েতে চিটাগাং চলে গেছেন। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল। ডাক্তার এ মল্লিক বর্তমানে খুলনার সিভিল সার্জন। তাঁর চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ। কিছুদিনের মধ্যেই এলপিআরে চলে যাবেন।

খুলনা যাবার ব্যবস্থাও মিসির আলি চট করে করতে পারলেন না। দুটো কোর্স ঝুলছে মাথার উপর। সেশন জট সামলাবার জন্যে স্পেশাল ক্লাস হচ্ছে। মিডটার্ম পরীক্ষা। প্রচুর খাতা জমা হয়ে আছে। খাতা দেখতে হবে। খুলনা জায়গাটাও এমন নয় যে দিনে দিনে গিয়ে চলে আসা যায়।

তিনি মনে-মনে একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, মুনিরকে সঙ্গে নিয়েই খুলনা যাবেন। সেই পরিকল্পনাও কার্যকর করা যাচ্ছে না। মুনিরের দেখা নেই। সেই যে ডুব দিয়েছে, ডুবই দিয়েছে। আর উদয় হচ্ছে না। তার ঠিকানা জানা নেই বলে যোগাযোগ করা হচ্ছে না। সে কোথায় থাকে তা একবার মনে হয় বলেছিল--এখন মনে পড়ছে না। মানুষের মস্তিষ্কের একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সে খুব যত্ন করে মনে করে রাখে, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো মুছে ফেলে। যে-টেলিফোন নাম্বারটি মনে করা দরকার সেটি মনে পড়ে না, অথচ প্রয়োজন নেই এমন টেলিফোন নাম্বারগুলো একের পর এক মনে পড়তে থাকে।

ডাক্তার এ মল্লিক। মানুষটি ছোটখাট। চেহারায় বয়সের তেমন ছাপ নেই, তবে মাথার সমস্ত চুল পাকা। যেন শরতের সাদা মেঘের একটা টুকরো মাথায় নিয়ে হাসিখুশি ধরনের এক জন মানুষ বসে আছেন। ডাক্তার এ মল্লিক বললেন, 'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি-না। আমার নাম মিসির আলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা, আগে বলবেন তো।'

'আগে বললে কি হত?'

'না, মানে আরো খাতির করে বসাতাম।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'আপনি যথেষ্ট খাতির

করেছেন। ছুটির দিন, কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বাতিল করলেন।'

'বাতিল করি নি। বাতিল করলে উপায় আছে? মহিলারা সেজেগুজে বসে আছে। তারা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। হা হা হা। কি ব্যাপার বলুন।'

'আমি না-হয় বিকেলে আসি?'

'পাগল হয়েছেন? বিকেলে দুটো প্রোগ্রাম। একটা জন্মদিন, একটা বিয়ে। যা বলবার এক্ষুণি বলুন। আমার নিজের কোথাও বেরুতে ইচ্ছা করছে না। আপনি আসায় একটা অজুহাত তৈরি হল। বাড়ির মেয়েদের বলতে পারব কাজে আটকা পড়েছি। হা হা হা। আসুন, আমার একটা ব্যক্তিগত ঘর আছে, সেখানে যাই।'

ডাক্তার সাহেবের ব্যক্তিগত ঘর দেখার মতো। মেঝেতে কার্পেট। বসার জন্যে চমৎকার কিছু রকিং চেয়ার। দেয়ালে অরিজিন্যাল পেইন্টিং। ঘরটিতে এয়ারকুলারও বসান।

'এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব ড্রয়িং রুম। খুব নির্বাচিত কিছু অতিথির জন্যে।'

'আমি কি খুব নির্বাচিত কেউ?'

'কি জন্যে আপনি এসেছেন তা জানার পর বোঝা যাবে। তবে একটা অনুমান অবশ্যি করছি। ঢাকা থেকে শুধু আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন, সেই থেকেই অনুমানটা করছি। হা হা হা। একটু বসুন। ঠাণ্ডা কিছু দিতে বলি।'

মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে খুব বিনীত ভঙ্গিতে মিষ্টির প্লেট নামিয়ে লাজুক হাসি হাসল। মিসির আলির অস্বস্তি আরো বাড়ল। তাঁর মন বলছে, এই মেয়েটির বিয়ের কোনো কথাবার্তা হচ্ছে। এবং তারা ধরেই নিয়েছে তিনি ঢাকা থেকে এই ব্যাপারেই এসেছেন।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, যাচ্ছে না। তার উপর এই বোধহয় নির্দেশ।

'কি নাম তোমার খুকি?'

'আমার নাম মীরা।'

'বাহ্, খুব সুন্দর নাম। কী পড়?'

'বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ি।'

'বাহ্, ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তার! এখন কি কলেজ ছুটি?'

'জ্বি-না। বাবা হঠাৎ আসতে লিখলেন⋯।'

মেয়েটি কথা শেষ করল না। হঠাৎ অস্বাভাবিক লজ্জা পেয়ে গেল। মিসির আলি মনে-মনে ভাবলেন, চমৎকার একটি মেয়ে! এই মেয়ের বিয়ের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত থাকা একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

'মীরা, তুমি এখন যাও। তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও।'

ডাক্তার সাহেব ঘরে ঢুকলেন হাসিমুখে, 'কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে?'

খুব ভালো মেয়ে! চমৎকার মেয়ে! আমি কিন্তু আপনার মেয়ের বিয়ের কোনো ব্যাপারে আসি নি। অন্য ব্যাপারে এসেছি। তবে মীরার বিয়ের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারলে অত্যন্ত খুশি হব।

ডাক্তার সাহেব নিভে গেলেন। মিসির আলির বেশ খারাপ লাগল।

'ঢাকা থেকে কি কারোর আসার কথা ছিল?'

'জ্বি, ছিল। গত পরশু আসার কথা। সেই জন্যেই মেয়েটাকে বরিশাল থেকে

আনালাম। আমার বড় মেয়ে থাকে রাজশাহী, সেও এসেছে। মোটামুটি একটা বেইজ্জতি অবস্থা?'

'নিশ্চয়ই কোনো-একটা ঝামেলা হয়েছে, যে জন্যে আসতে পারছে না।'

'তা তো হতেই পারে। কিন্তু খবর তো দেবে?'

'আপনি যদি চান তাহলে তৃতীয় পক্ষ হয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারি।'

ডাক্তার সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে প্রস্তাবটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, তবে সরাসরি হ্যাঁ বলতে তাঁর বাধছে। সম্ভবত স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ করবেন। তারপর বলবেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমি কি জন্যে এসেছি সেটা কি আপনাকে বলব?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনি কি অনেকদিন নেত্রকোণায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ছিলাম। পাঁচ বছর ছিলাম নেত্রকোণা সদর হাসপাতালে। সে তো অনেক দিন আগের কথা।'

'কামরুদ্দিন সাহেব নামে কাউকে চিনতেন? উকিল? বেশ নামকরা উকিল।'

'খুব ভালো করে চিনতাম। অত্যন্ত মেজাজি লোক ছিলেন। অসম্ভব দিল-দরিয়া। টাকা রোজগার করতো দুই হাতে, খরচ করতো চার হাতে। কী-একটা অনুষ্ঠান একবার করলেন—ছেলের আকিকা কিংবা মেয়ের জন্মদিনে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য।'

'ভদ্রলোক মারা গেলেন কীভাবে?'

'অ্যাপেনডিসাইটিস। মফস্বল শহরের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। অপারেশনের সে রকম সুবিধা নেই। আমিও ছিলাম না। থাকলে একটা কিছু অবশ্যই করতাম। ঐ দিনই রাত দশটার ট্রেনে ময়মনসিং চলে আসি। আপনি এইসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'একটা কারণ আছে। কারণটা এই মুহূর্তে বলতে চাই না। পরে বলব।'

'আপনি কি ওদের কোনো আত্মীয়?'

'জ্বি-না। কামরুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানেন?'

'কোন বিষয়ে বলুন তো?'

'উনি কেমন ছিলেন, কীভাবে মারা গেলেন, এইসব।'

'খুব রূপবতী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো মানসিক পরিবর্তন ওঁর হয়েছিল কি না জানি না, তবে নানান রকম গুজব শহরে ছড়িয়ে পড়ে।'

'কি রকম গুজব?'

'অভিভাবকহীন রূপবতী মেয়েদের নিয়ে যেসব গুজব সাধারণত ছড়ায়, সেইসব আর কি। সহজলভ্য মেয়ে—এই সব কথাবার্তা। পুরুষদের খুব আনাগোনাও নাকি ছিল।'

'মারা যান কীভাবে?'

'সেই সম্পর্কেও নানান গল্প আছে। কুৎসিত গল্প। পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল, গ্রাম্য উপায়ে খালাস করতে গিয়ে কি সব হয়েছে ···· আমি এর বেশি কিছু জানি

না। গুজবের ব্যাপারে আমার উৎসাহ কিছু কম। তবে এইসব গুজবের পেছনে কিছু সত্যি সাধারণত থাকে।'

মিসির আলি পকেট থেকে প্যাডের কাগজটি বের করে বললেন, 'ভালো করে দেখুন তো এই কাগজের লেখাটি আপনার?'

'আমার তো বটেই।'

'আপনার নিজের হাতে লেখা!'

'নিশ্চয়ই।'

'লেখাটা দয়া করে পড়ে দেখুন।'

মল্লিক সাহেব লেখা পড়ে দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইলেন। একটি কথাও বললেন না।

'আপনি লিখেছেন এ লেখা?'

'না।'

'হয়তো অন্য কোনো কামরুদ্দিন সম্পর্কে লিখেছেন।'

'এই নামে নেত্রকোণায় অন্য কোনো উকিল ছিল না, এবং আমি অপারেশনের ব্যাপারে সাহায্য চেয়েও চিঠি লিখি নি।'

'হয়তো আপনার মনে নেই।'

'দেখুন প্রফেসর সাহেব, আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। আপনার ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি কি কোনোভাবে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন?'

'ছি ডাক্তার সাহেব, ভুলেও এ-রকম কিছু ভাববেন না। আমি একটা জটিল রহস্যের জট ছাড়াবার চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু না। আমি আজ উঠি?'

'আমার লেখা এই চিঠি আপনাকে কে দিল?'

'অন্য এক দিন আপনাকে বলব।'

'অন্য কোনোদিন আপনাকে আমি পাব কোথায়?'

'আমি আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।'

মিসির আলি ঠিকানা লিখলেন। মল্লিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি জিগাতলায় থাকেন?'

'জ্বি।'

'রহমান সাহেবের বাসা চেনেন? ২২/১৩, তিনতলা বাড়ি। আই স্পেশালিস্ট টি রহমান?'

'জ্বি-না। তবে আপনি যদি তাঁদের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চান, আমি ঠিকানা বের করে খবর পৌঁছে দেব।'

'কোনো খবর দিতে হবে না।'

'ও-বাড়ি থেকেই কি কারো আসার কথা ছিল?'

'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'অনুমান করছিলাম।'

ডাক্তার এ মল্লিক অপ্রসন্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি চিন্তিত ও বিরক্ত। তাঁর আজকের ছুটির দিনটি নষ্ট হয়েছে।

'যাই ডাক্তার সাহেব?'

তিনি জবাব দিলেন না।

৭

মতিঝিল পাড়ার অফিস। নাম আলফা ট্রান্সপোর্ট। নাম থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে কাজকর্ম পাঁচমিশালি--অটোমোবাইল ইন্স্যুরেন্স, ট্রাভেল এজেন্সি এবং ইণ্ডেনটিং।

বৃহস্পতিবার অর্ধেক দিন অফিস। মুনিরের হাতে তেমন কাজ নেই। সে বসেছে এ্যাসিসটেন্ট ক্যাশিয়ার নিজামুদ্দিন সাহেবের পাশে। নিজামুদ্দিন সাহেবের ব্যালেন্স শীটে সতের টাকার গণ্ডগোল। হিসাব মিলছে না। তিনি মুনিরকে ডেকে নিয়ে গেছেন, যাতে সে ঠাণ্ডা মাথায় ফিগারগুলি চেক করতে পারে।

নিজামুদ্দিন সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এল ডি ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলেন। দুটো প্রমোশন পেয়ে এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার হয়েছেন। গত বছর একটা গুজব উঠেছিল, তিনি অফিসার্স গ্রেড পাচ্ছেন। তা পান নি। তাঁর পাঁচ বছরের জুনিয়র শমসের সাহেব পেয়েছেন। এই নিয়ে নিজামুদ্দিন সাহেবের মনে কোনো ক্ষোভ নেই। দিনের শেষে ক্যাশের হিসাব পুরোপুরি মিটে গেলেই তিনি মহাসুখী। এই হিসাব তাঁর প্রায়ই মেলে না। তখন তাঁকে দেখে মনে হয়, তাঁর মাথা-খারাপ হতে বেশি বাকি নেই।

এই মানুষটিকে মুনিরের খুব পছন্দ। ভদ্রলোক সব কিছুই অত্যন্ত দ্রুত করেন। দ্রুত কথা বলেন। দ্রুত লেখেন এবং দ্রুত রেগে যান। অতি দ্রুত রাগ চলেও যায়। তখন ধরা গলায় বলেন, ''মিসটেক'' হয়েছে। মনের মধ্যে কিছু রাখবেন না, তাহলে কষ্ট পাব। ''এক্সকিউজ'' করে দেন।'

জুনিয়র কর্মচারীদের কেউ তাঁকে স্যার বললে তিনি শীতল গলায় বলেন, 'আমাকে স্যার ডাকবেন না। স্যার ডাকলে নিজেকে মাস্টার-মাস্টার মনে হয়। বরং ভাই ডাকবেন। ''ব্রাদারের'' উপর কোনো ডাক হয় না।'

মুনির নিজেও সতের টাকার কোনো সমাধান করতে পারল না। দেখা যাচ্ছে ক্যাশে সতের টাকা আসলেই কম। নিজামুদ্দিন সাহেবের মুখ অন্ধকার। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন।

মুনির বলল, 'নিজাম ভাই, আপনি আজ চলে যান। শনিবার না হয় আরেক বার দেখব।'

'শনিবার দেখলে তো হবে না। দিনের হিসাব মেটাতে হয় দিনে।'

তিনি নিজের পকেট থেকে সতেরো টাকা রাখলেন আয়রন সেফে। কাগজপত্র সই করলেন। মুনিরের খুব মন-খারাপ হল।

বেচারার সতের টাকা চলে গেল, এই জন্যে নয়, যে-হিসাবের জন্য ভদ্রলোকের এত মমতা সেই হিসাব মিলছে না দেখে। মুনিরের মনে হচ্ছে এই সরল-সহজ মানুষটা হয়তো কেঁদে ফেলবে।

'নিজাম ভাই।'

'কি?'

'আসুন, আরেক বার আমরা দু' জন মিলে বসি। চেক এবং কাউন্টার চেক। ভাউচারগুলিও দেখেন। কোনোটা হয়তো ইংরেজিতে লেখা, তুলেছেন বাংলায়।

নিজামুদ্দিন সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহে কাগজপত্র বের করলেন। মুনির কাগজপত্র নিয়ে বসতে পারল না। এজিএম কাদের সাহেব ডেকে পাঠালেন। নরম গলায় বললেন, 'আমাকে কয়েকটা জিনিস টাইপ করে দিতে পারবে?'

প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় অফিসের কোনো কাজ নয়। অফিসের কাজ হলে বলতেন, 'খুব জরুরি। টাইপ রাইটার নিয়ে বসে যাও। মিসটেক যেন না-হয়। স্পেসিং ঠিক রাখবে।'

এখন তা বলছেন না। নরম স্বরে কথা বলছেন। এজিএম ধরনের কেউ নরম স্বরে কথা বলে--এটাও এক অভিজ্ঞতা।

'একটু এক্সট্রা টাইম কাজ করতে হবে, পারবে?'

'পারব স্যার।'

'গুড।'

কাদের সাহেব মানিব্যাগ খুলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একটা দশ টাকার নোট বের করলেন।

'নাও দুপুরে কিছু খেয়ে নিও।'

'কিছু লাগবে না স্যার।'

'আরে নাও নাও।'

মুনির হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। নিজেকে তার ভিখিরির মতো মনে হচ্ছে। অথচ না নিয়েও উপায় নেই। কাদের সাহেব টাকা না নেয়ার অন্য অর্থ করে বসতে পারেন।

'কতক্ষণ লাগবে?'

'ঘন্টাখানিক।'

'গুড। আমি একটু বেরুচ্ছি। একঘন্টা পরে এসে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

একটার মধ্যেই কাজ শেষ--এজিএম সাহেবের দেখা নেই। অফিস খালি হয়ে গেল দেড়টার মধ্যে। দারোয়ান তালাচাবি লাগিয়ে দিল। নিজাম সাহেব বললেন, 'তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

'এ ছাড়া আর কি করব?'

'একা একা কতক্ষণ দাঁড়াবে? আমিও অপেক্ষা করি?'

'আপনি চলে যান নিজাম ভাই। স্যার এসে পড়বেন। জরুরি কাজ।'

'জরুরি কাজ না হাতি। জরুরি কাজ হলে চলে যেত না। পাশে বসে থাকত।'

'আপনি চলে যান নিজাম ভাই।'

'একা তোমাকে রেখে চলে যেতে খারাপ লাগছে।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না। এই ঘন্টাখানিক।'

ঘন্টাখানিক নয়, মুনির সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কাগজগুলো হয়তো জরুরি। আগামীকাল ছুটি। কাদের সাহেব এই ছুটির মধ্যে তাকে খুঁজে পাবেন না। সেও কাদের সাহেবের বাসার ঠিকানা জানে না।

মুনিরের রীতিমতো কান্না পেতে লাগল। বারান্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টের। সময় কাটতেই চায় না। দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। অফিসের পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা। টোস্ট, কলা এইসব পাওয়া যায়। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। বরং নিজেকে কোনো-না-কোনোভাবে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করছে। মুনির ঠিক করল, রাতেও সে কিছু খাবে না। দু'গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে থাকবে। মাঝে-মাঝে সে এ-রকম করে।

সন্ধ্যা মেলাবার আগেই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল।

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি একবার শুরু হলে থামবে না। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছে। তা লাগুক। কাগজগুলো না-ভিজলেই হয়। মুনির সদর দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। পা টাটাচ্ছে। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। বৃষ্টির জন্যেই বেশ কয়েকজন ভিখিরিণী আশ্রয় নিয়েছে। খুব অল্প সময়েই এরা কেমন গুছিয়ে নিয়েছে। পা ছড়িয়ে গল্পগুজব করছে। এক জন আবার রাস্তা আড়াল করে বসে বিড়ি ধরিয়েছে। মুনিরকে দেখে একটু লজ্জা-লজ্জা পাচ্ছে। অন্য এক জনের কোলে ছোট্ট একটা বাচ্চা। সে বাচ্চাটির সঙ্গে নিচুগলায় কী সব গল্প করছে। এ-রকম ছোট তিন-চার বছরের শিশুর কোনো গল্প বোঝার কথা নয়। কিন্তু শিশুটি মনে হয় বুঝতে পারছে।

বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ নেই। রাস্তায় একহাঁটু পানি। এই পানি ভেঙে এজিএম সাহেবের গাড়ি আসবে না। তিনি নতুন গাড়ি কিনেছেন। গাড়ির গায়ে এক ফোঁটা পানি পড়লে আঁৎকে ওঠেন।

বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়ছে। শ্রাবণ মাসে ঝড় হবার কথা শোনা যায় না, বাতাসের গতিক দেখে মনে হচ্ছে ঝড় হবে। পাশের চায়ের দোকান ঝাঁপ বন্ধ করছে।

'মুনির, এই মুনির।'

মুনির চমকে উঠল। নিজামুদ্দিন সাহেব। পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত তোলা। মাথায় ছাতা থাকা সত্ত্বেও ভিজে জবজব করছেন। পাঞ্জাবি লেপ্টে গায়ের সঙ্গে মিশে আছে।

'আমার তাই সন্দেহ হচ্ছিল। এই জন্যই এলাম, তুমি আছ এখনো?'

'বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি।'

'বৃষ্টি তো শুরু হল সন্ধ্যাবেলায়। কোন আক্কেলে তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলে! তুমি কি বায়েজিদ বোস্তামী? আবার হাসছ? এর মধ্যে হাসির কী হল!'

'আপনি আমার খোঁজে আবার এলেন?'

'আসব না তো কী করব? বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল তুমি এখনো আছ। এর নাম হচ্ছে ইনট্যুশন। এখন চল আমার সঙ্গে। নাকি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'কোথায় যাব?

'আমার বাসায়। আমার সঙ্গে আজ খাবে। তুমি মহা মূর্খ। মহা-মহা মূর্খ।'

নিজাম সাহেবের বাসা ভূতের গলিতে। দু'-কামরার টিনের ঘর। কাঁচা রাস্তা পার হয়ে যেতে হয়। জায়গায়-জায়গায় খানাখন্দ। স্ট্রীট লাইট নেই। ইলেকট্রিসিটি না থাকায় সমস্ত অঞ্চলটাই অন্ধকারে ডুবে আছে। নিজাম সাহেব হাত ধরে-ধরে মুনিরকে নিয়ে যাচ্ছেন। কাদায় পানিতে দু' জনই মাখামাখি। নিজাম সাহেব সারা পথ গালাগালি

করতে–করতে আসছেন। কিছুক্ষণ পর–পর বলছেন, 'তুমি মহা মূর্খ।'

মুনিরের বড় ভালো লাগছে। অনেক দিন পর সে কোনো মানুষের মধ্যে এমন গাঢ় মমতার পরিচয় পেল। এই ঝড়–বৃষ্টির রাতে ভদ্রলোক একা–একা গিয়েছেন খোঁজ নিতে।

বাড়ি পৌঁছামাত্র গরম পানির ব্যবস্থা হল। নিজাম সাহেব ঠেলে তাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন। বাথরুম অন্ধকার। সারা বাড়িতে একটামাত্র হারিকেন।

'মুনির।'

'জ্বি?'

'তাকে সাবান আছে।'

'কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'দরজা বন্ধ করার দরকার কী? খোলা রাখ।'

মুনির দরজা অল্প একটু ফাঁক করল। ভেতরবাড়ির সবটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রক–পরা কিশোরী একটি মেয়ে বারান্দায় কেরোসিন কুকারে রান্না চড়িয়েছে। মেয়েটির পাশে ভেজা–কাপড়ে নিজাম সাহেব। কি যেন বলছেন মেয়েকে, আর মেয়ে বারবার হেসে উঠছে। অন্ধকারে এই হাসির শব্দ এত মধুর লাগছে!

বাড়িতে আর কোনো লোকজন নেই। নিজাম সাহেবের স্ত্রী মারা গেছেন অল্প কিছুদিন আগে। দেশের বাড়িতে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলেন। জ্বরের সঙ্গে ধীরে–ধীরে আরো সব উপসর্গ যুক্ত হল। খবর পেয়ে নিজাম সাহেব গেলেন দেশে। তিন দিনের আর্নড লীভ নিয়ে গিয়েছিলেন। দু' দিনের দিন ফিরে এসে যথারীতি হিসাবের খাতা নিয়ে বসলেন। বিকেলে অফিসের ছুটির পরও বসে রইলেন। মুনির এসে বলল, 'নিজাম ভাই বাসায় যাবেন না? নাকি আজও হিসাবের গণ্ডগোল আছে?'

নিজাম সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'অন্যের হিসাব মিলিয়ে দিয়েছি। নিজেরটা মেলে না। আমার স্ত্রী মারা গেছে। বাড়ি গিয়ে দেখি দশ মিনিট আগে ডেডবডি কবর দিয়ে ফেলেছে। অনেকেই বলেছিল কবর থেকে আবার তোলা হোক। শেষ দেখা। আমি নিষেধ করলাম।'

নিজাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তার চেহারায় বা আচার–আচরণে শোকের কোনো ছাপ নেই। অফিসের হিসাব না–মিললে এই মানুষটি অনেক বেশি বিচলিত হয়।

পাটি বিছিয়ে খাওয়ার আয়োজন। উচ্ছে ভাজা, চিংড়ি মাছ, ডাল এবং একটা শব্জি। কিশোরী মেয়েটি খাবার তুলে তুলে দিচ্ছে। মেয়েটির মুখ গোলাকার, নাক ঈষৎ চাপা তবু তারি মিষ্টি লাগছে মেয়েটিকে। মেয়েটির কথাবার্তায় কোনো আড়ষ্টতা নেই, যেন মুনিরকে সে অনেক দিন থেকে চেনে। মেয়েটি মিষ্টি রিনরিনে গলায় কথা বলছে এবং খুব কৌতূহলী চোখে মুনিরকে দেখছে।

'বাবা প্রায়ই বাসায় এসে বলেন, আপনি নাকি বাবার হিসাব মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অফিসে যাবার সময় বলেন--ছেলেটিকে দাওয়াত করব। আপনাকে বোধহয় আর বলেন না। নাকি বলেন, আপনি আসেন না?'

মুনিরের কেন জানি লজ্জা করছে। চোদ্দ–পনের বছরের বাচ্চা একটি মেয়ে, তবু

কেন মুনির সহজ হতে পারছে না।

'নিজাম ভাই, আপনার কি একটিই মেয়ে?'

'হ্যাঁ, বিনুর বড় একটা ভাই ছিল। জন্মের পরপর মারা গেছে।'

'আপনার মেয়ে কী পড়ে?'

বিনু হেসে ফেলে বলল, 'আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন?'

'কী পড় তুমি?'

'আইএ পড়ি।'

নিজাম সাহেব বললেন, 'আর পড়াশোনা হবে না। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এ দেশে বিয়ের পর মেয়েদের পড়াশোনা হয় না।'

মুনির বিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে?'

বিনু আবার হেসে ফেলল। হাসিমুখে বলল, 'যে-সব প্রশ্ন বাবাকে করা দরকার, সে-সব প্রশ্ন আপনি করছেন আমাকে। আর যে-সব প্রশ্ন আমাকে করা দরকার, সে-সব করছেন বাবাকে। আপনি মানুষ এত অদ্ভুত কেন?'

'তুমি কিছু মনে করো না।'

'না, কিছু মনে করছি না। আপনার কি গরম লাগছে?'

'গরম লাগবে কেন? গরম লাগছে না।'

'ঘামছেন কেন?'

বিনুর প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটল। চোখের সামনের জগৎ হঠাৎ কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। শব্দ অস্পষ্ট। ঘোলাটে আলোর তীব্রতা দ্রুত কমছে—কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মুনির তলিয়ে যাচ্ছে শব্দহীন আলোহীন এক জগতে। শরীরের কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করছে না। এই অবস্থা কতক্ষণ ছিল মুনিরের মনে নেই। ঘোর কাটল। কিছু-কিছু আলো সে দেখতে পাচ্ছে। দু'একটা শব্দ কানে আসছে। মুনির ক্লান্ত গলায় বলল, 'পানি খাব।'

'এইমাত্র না পানি খেলে! আবার পানি কেন? সত্যি খেতে চাও?'

মুনির স্পষ্ট করে তাকাল। সে একটা অচেনা বাড়ির অচেনা বারান্দায় বসে আছে। তার সামনে বিনু। তার গায়ে ঘরোয়া ভঙ্গিতে পরা হালকা নীল রঙের একটা সুতির শাড়ি। বারান্দায় একটা পাটি পাতা। বিনু বসেছে পাটিতে। সে একটা চেয়ারে বসে আছে। রাত। বারান্দায় চাঁদের আলো আছে।

'এই, সত্যি সত্যি পানি চাও?'

'চাই।'

বিনু উঠে গেল। এই বাড়ি কার? এই মেয়েটির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, জায়গাটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। বছরখানিক আগে প্রথম যা হয়েছিল, এও কি তাই? তার কি দুটো জীবন? এই দুটো জীবন কি পাশাপাশি চলছে?

'নাও, পানি নাও।'

মুনির যন্ত্রের মতো হাত বাড়াল। ঠাণ্ডা কনকনে পানি।

'ও কি, গ্লাস হাতে বসে আছ কেন?'

'এটা কোন জায়গা?'

'এ আবার কি রকম কথা? কোন জায়গা মানে?'

'এম্নি বললাম।'

'চল, শুয়ে পড়ি। আর কতক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবে?'

মুনির যন্ত্রের মতোই একটা ঘরে ঢুকল। এটাই বোধহয় শোবার ঘর। বেশ বড়লোকের বাড়ি মনে হচ্ছে। সুন্দর করে সাজান। দেয়ালে তিন-চার বছরের একটা ফুটফুটে শিশুর ছবি। মেয়েটি বলল, 'শোন, চট করে ঘুমিয়ে পড়বে না। বাবার চিঠির জবাব দিয়ে তারপর ঘুমুবে। আমার তো মনে হয় তুমি তাঁর চিঠি পড় নি এখনো। নাকি পড়েছ?'

'না।'

'পড়ে শোনাব?'

'শোনাও।'

মেয়েটি ড্রয়ার খুলে চিঠি বের করল--গলার স্বর বুড়ো মানুষের মতো করে পড়তে শুরু করল—টুনু, তুমি দীর্ঘদিন যাবত আমার পত্রের জবাব দিতেছ না। ইহার কারণ বুঝিতে আমি অক্ষম। এক জন বৃদ্ধ মানুষের পত্রের জবাব দেওয়া সাধারণ ভদ্রতা। চাকরি এবং সংসার নিয়া তুমি ব্যস্ত আমি জানি। দুনিয়ার সকলেই ব্যস্ত। কেহ বসিয়া নাই। তোমার মা বাতে আক্রান্ত। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলিতেছে। তবে আমার ইচ্ছা তাহাকে ঢাকায় আনিয়া কোনো বড় ডাক্তারকে দিয়া দেখান। ঢাকায় বাত রোগের জন্য নামী ডাক্তারদের সন্ধান লইও।

বৌমাকে আদর ও স্নেহচুম্বন দিবে। তাহাকে অতি শীঘ্রই পৃথক পত্র দিব। ইতি

চিঠি পড়া শেষ করে মেয়েটি বলল, 'দেখলে, তোমার ওপর কি রকম রাগ করেছেন? একটা চিঠি লিখতে কতক্ষণ লাগে বল তো? কাগজ-কলম এনে দিই।'

মুনির সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দেয়ালে টাঙান ছবিটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কার ছবি?'

মেয়েটি দীর্ঘ সময় মুনিরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ ছলছল করছে। এই শিশুটি সম্ভবত তাদেরই। এবং খুব সম্ভব শিশুটি বেঁচে নেই। তার জন্যে মুনিরের কোনো দুঃখ বোধ হচ্ছে না। কারণ এই শিশুটিকে সে চেনে না। অতীতের কিছুই তার মনে পড়ছে না। সে দেখছে শুধু বর্তমান। এবং অদ্ভুত কোনো বর্তমান। এই বর্তমানের কোনো ব্যাখ্যা নেই। মুনির আবার বলল, 'ছবিটা কার?'

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তোমার কী হয়েছে! ছবি কার জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি জান না ছবি কার?'

বলতে-বলতে মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠল। মুনিরের ঘোর কেটে গেল। সে আগের জায়গাতেই আছে। ভাত-মাছ খাচ্ছে। বিনু মেয়েটি পাতে এক চামচ ডাল দিল। নিজাম সাহেব বললেন, 'দৈ আছে। টক দৈ। ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খাও। ভালো লাগবে।'

বিনু বলল, 'দৈ কিন্তু বাবা নেই। বেড়াল মুখ দিয়েছিল, ফেলে দিয়েছি। ইস্, আপনার বোধহয় খাওয়ায় খুব কষ্ট হল।'

'না, কষ্ট হয় নি।'

'এমন দিনে বাবা আপনাকে নিয়ে এসেছে যে, কোনো বাজার নেই। একটা যে ডিম ভেজে দেব সে উপায়ও নেই। ঘরে ডিমও ছিল না।'

'আমার কিচ্ছু লাগবে না।'
'আরেকদিন কিন্তু আপনি আসবেন। আসবেন তো?'
'হ্যাঁ, আসব।'
'খবর দিয়ে আসবেন।'
'আচ্ছা, খবর দিয়ে আসব।'
'আপনি কি পান খান?'
'না।'

মুনির বারান্দায় হাত ধুতে গেল। বিনু সঙ্গে করে পানি নিয়ে এসেছে। এখন আর বৃষ্টি নেই। মেঘ কাটতে শুরু করেছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। শ্রাবণ মাসের চাঁদ অপূর্ব হয়, কে জানে আজ কেমন হবে?

৮

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'কি ব্যাপার, আজ খালি হাতে যে! আমার সিগারেট কোথায়?'

মুনির লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। মিসির আলি বললেন, 'আজকালের মধ্যে না এলে আমি নিজেই উপস্থিত হতাম তোমার ওখানে।'

'আমি কোথায় থাকি তা তো আপনি জানেন না।'

'আগে জানতাম না। এখন জানি। শার্লক হোমসের মতো বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছি। শুনতে চাও?'

'চাই।'

'প্রথমে খোঁজ করলাম ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে। দেখা গেল এই নামে কোনো অফিস নেই। তুমি ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিলে।'

'ভুল দিই নি। আগে এই নাম ছিল। এখন নাম বদলেছে।'

'যখন দেখলাম অফিস থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না, তখন পাড়ার ছোট-ছোট পান-বিড়ির দোকানগুলোতে খোঁজ করতে লাগলাম। কারণ তুমি সিগারেট খাও। এইসব দোকানগুলোতে তোমাকে একাধিকবার যেতে হবে।'

'সিগারেট খাই, কী করে বুঝলেন! আপনার সামনে তো কখনো খাই নি।'

'তোমার পকেটে দেশলাই দেখেছি। তা ছাড়া যে সিগারেট খায়, সে-ই সাধারণত অন্যকে সিগারেট উপহার দেবার কথা ভাবে।'

'দোকান থেকেই আমার খোঁজ পেলেন?'

'হ্যাঁ। মুনির, তুমি চা খাবে?'

'হ্যাঁ, খাব।'

'তুমি কথায়-কথায় স্যার বল, আজ এখন পর্যন্ত একবারও বল নি। কারণটা কী?'

'স্যার, আমি চা খাব।'

মিসির আলি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তার মনে হল, ছেলেটি বেশ রসিক। এবং

সে সহজ হতে শুরু করেছে। যত সহজ হবে, ততই তাঁর জন্যে ভালো। প্রচুর তথ্য তাঁর দরকার। তথ্য ছাড়া এগুবার কোনো পথ নেই। তিনি নিজে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না। ছেলেটির উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হবে।

'আজ আমাকে কিছু বলবে মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, বলব।'

'বাতি নেভাতে হবে?'

'না।'

মুনির খুব সহজ ভঙ্গিতে নিজাম সাহেবের বাড়ির ঘটনার কথা বলল। কেমন করে হঠাৎ পট পরিবর্তন হল, সে-সময় তার অনুভূতি কী ছিল, সবই সুন্দর করে গুছিয়ে বলল। শিশুটির দেয়ালে টাঙান ছবিটির কথা, তার পানি চাইবার কথা—কিছুই বাদ দিল না। মিসির আলি একটি প্রশ্নও করলেন না। সমস্ত বর্ণনাটা শুনলেন চোখ বন্ধ করে। এক বারও তাকালেন না।

'তোমার বলা শেষ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'তোমার বর্ণনা থেকেই মনে হচ্ছিল, বিনু মেয়েটি তোমাকে অভিভূত করেছে। রূপবতী কিশোরী মেয়ে। তার সহজ সরল ব্যবহার, তার যত্ন—এইসব তোমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই না?'

'জ্বি।'

'তুমি প্রবলভাবে মেয়েটিকে কামনা করেছ। সেই সঙ্গে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছ। এই প্রচণ্ড কামনা বা প্রবল আকর্ষণের কারণে তোমার মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্যে মেয়েটিকে তুমি দেখেছ তোমার স্ত্রী হিসেবে। পুরোটাই তোমার কল্পনা। ডে-ড্রীমিং। এক ধরনের ইচ্ছেপূরণ স্বপ্ন।'

'হতে পারে।'

'আগের বার তুমি একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলে। এবার কিছু আন নি?'

'না।'

আবার যদি কখনো এ-রকম হয়, একটা জিনিস মনে রাখবে--কিছু একটা হাতে নেবে। খবরের কাগজ হলে খুব ভালো হয়।'

'খবরের কাগজ দিয়ে কী করবেন?'

'খবরের কাগজে একটা তারিখ থাকে। এই তারিখটা দেখব। তুমি তোমার অন্য একটা জীবনের কথা বলছ। মনে হচ্ছে দুটো জীবন পাশাপাশি চলছে। সেই জীবনের সময় এবং এই জীবনের সময়ও কি পাশাপাশি?'

'তার মানে আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'না, করছি না। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারছি না। কিছু একটা দাঁড় করাতে হলে আমার প্রচুর তথ্য দরকার। সেইসব তথ্য আমার হাতে নেই। তবে তুমি যে-গল্প বলছ, তার কাছাকাছি গল্প বিভিন্ন উপকথায় চালু আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। একটা শুধু তোমাকে বলি। এক লোক পুকুরে গোসল করতে নেমেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, গোসল শেষ করে বাসায় গিয়ে খাবে। পানিতে ডুব দিয়ে যেই উঠল ওম্নি

সে দেখে, সব কিছু কেমন অন্য রকম লাগছে। সব অচেনা। সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিজেও বদলে গেছে। সে এখন আর পুরুষ নয়। রূপবতী এক যুবতী। সে কাঁপতে কাঁপতে পানি ছেড়ে উঠে এল। এক সওদাগর তখন তাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। সওদাগরের সঙ্গে তার বিয়ে হল। চারটি ছেলেমেয়ে হল। তারপর একদিন দুপুরে সে সবাইকে নিয়ে গোসল করতে এসেছে। পানিতে ডুব দিয়ে ওঠামাত্র দেখল, সে তার পরিচিত জগতে উঠে এসেছে। আবার সে পুরুষ। সে দ্রুত তার বাড়িতে গেল। স্ত্রী ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছে। লোকটির মন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। বারবার চারটি পুত্র–কন্যার কথা তার মনে পড়ছে। ওরা কোথায় আছে, কী করছে, কে জানে? হয়তো ব্যাকুল হয়ে মাকে খুঁজছে।'

মুনির বলল, 'এটা তো উপকথা। সত্যি নয়।'

'তা ঠিক। তবে সব গল্পের পেছনেই এক ধরনের ''সত্যি'' ব্যাপার থাকে। এর পেছনেও কিছু–না–কিছু থাকতে পারে। আমি এইজাতীয় সব গল্প জোগাড় করছি। প্যারালাল ওয়ার্ল্ডজাতীয় যত বই পাচ্ছি পড়ছি।

মুনির ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রী হিসেবে যে–মেয়েটিকে দেখেছ, তার বয়স কি ফ্রক–পরা মেয়েটির চেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, হচ্ছিল।'

'তোমার শোবার ঘরে জানালায় পর্দা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'পর্দার রঙ মনে আছে?'

'জ্বি–না।'

'ঘরের বিছানায় যে–চাদর ছিল, তার রঙ কী?'

'আমার মনে নেই।'

'তাহলে ব্যাপারটা স্বপ্ন হবারই সম্ভাবনা। কারণ, শুধু স্বপ্নদৃশ্যগুলোই হয় সাদাকালো।'

'আমি কিন্তু দেখেছি, ঐ মেয়েটির পরনে নীল রঙের শাড়ি।'

'নিজাম সাহেবের মেয়েটির পরনে নিশ্চয়ই কিছু ছিল। যে–কারণে তুমি ভাবছ তোমার স্বপ্নে দেখা স্ত্রীর গায়ের শাড়িটি নীল।'

মুনির চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'নিজাম সাহেবের মেয়েটির গায়ে কী ছিল?'

'ফ্রক বা কামিজজাতীয় কিছু।'

'তার রঙ কী ছিল?'

'নীল।'

মিসির আলি অল্প হাসলেন। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার এই নিয়ে দু' বার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। দু' বারই তুমি ছিলে ক্লান্ত, বিরক্ত, হতাশ। তাই না?'

'জ্বি।'

'এখন থেকে মাঝে–মাঝে চেষ্টা করে দেখবে, নিজ থেকে ঐ জগতে যেতে পার

কি না। যখন একা-একা থাকবে তখন চেষ্টা করবে। ঐ জগতে যেতে চাইবে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কোনো এক জন ভালো নিউরোলজিস্টকে দিয়েও তোমার ব্রেইন ওয়েভগুলো পরীক্ষা করাতে চাই। আমি প্রফেসর আসগর নামে এক নিউরোলজিস্টের সঙ্গে কথাও বলে রেখেছি। তুমি কি কাল বিকেল পাঁচটায় একবার আমার কাছে আসতে পারবে?'

'পারব। কিন্তু স্যার, নিউরোলজিস্ট তো অনেক টাকা নেবে!'

'সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মিসির আলির সে-রাতে ভালো ঘুম হল না। ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখে রাত তিনটায় ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাতটা জেগে কাটাতে হল। স্বপ্নদৃশ্য নিয়েও প্রচুর চিন্তা করলেন। অবদমিত কামনাই স্বপ্নে উপস্থিত হয়। ব্যাখ্যা সহজ এবং চমৎকার, কিন্তু তবু কোথাও যেন একটা ফাঁকি আছে। কিছু-একটা বাকি থেকে যায়। সেই কিছুর রহস্য কি কোনো দিন ভেদ হবে?

আচ্ছা, পশু-পাখি এরাও কি স্বপ্ন দেখে? অবদমিত কামনা কি তাদের নেই? পশুদের স্বপ্ন কেমন হয়? স্বপ্ন দেখার সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপতে থাকে--বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাকে বলে Rapid eye movement (REM). ঐ জাতীয় কম্পন তিনি একটি ঘুমন্ত কুকুরের চোখের পাতায় দেখেছিলেন। সেই কুকুরটি কি তখন স্বপ্ন দেখছিল? জানার কোনো উপায় নেই।

মিসির আলির খানিকটা মন খারাপ হল। এক দিন না এক দিন এইসব রহস্যের সমাধান হবে, কিন্তু তিনি জেনে যেতে পারবেন না। মানুষ স্বল্পায়ু প্রাণী--এটাও একটা গভীর বেদনার ব্যাপার। এত বুদ্ধি নিয়ে সৌরজগতে যে-প্রাণীটি এসেছে, তার কর্মকাল সীমাবদ্ধ।

তিনি বাতি নিভিয়ে ঘুমের চেষ্টা করছেন--লাভ হচ্ছে না। বিচিত্র সব চিন্তা মাথায় আসছে। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো মিল নেই। আবার মিল আছেও। অদৃশ্য যে সুতোয় মিলগুলো গাঁথা, সে-সুতোটির নাম অনন্ত মহাকাল--The eternity.

৯

নিউরোলজিস্ট প্রফেসর আসগর বিশালদেহী মানুষ। গোলগাল মুখ। মাথাভর্তি টাক--তীক্ষ্ণ চোখ। শিশুরা ভয় পেয়ে যাবার মতো চেহারা, কিন্তু মানুষটি হাসিখুশি। কারণে অকারণে রোগীকে ধমক দেয়ার বাজে অভ্যাসটি এখনো অর্জন করেন নি।

ভদ্রলোক অনেক ঝামেলা করলেন। প্রথম বারের স্ক্যানিং ভালো হয় নি, দ্বিতীয় বার করলেন। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলেন না। চোখে পড়ার মতো কোনো অস্বাভাবিকতা ব্রেইন ওয়েভে নেই। তিনি হেসে বললেন, 'আপনি এক জন খুবই সুস্থ মানুষ। শুধু শুধু আমার কাছে এসেছেন। আপনার অসুবিধা কী?'

'কোনো অসুবিধা নেই। মাঝে মাঝে আজেবাজে স্বপ্ন দেখি, এই অসুবিধা।'

'আজেবাজে স্বপ্ন তো সবাই দেখে। আমিও দেখি। একবার কী দেখলাম জানেন? বাংলা একাডেমিতে গ্রন্থমেলা হচ্ছে, আমি শুধু একটা আণ্ডারওয়্যার পরে সেই গ্রন্থমেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। হা হা হা।'

মুনির হেসে ফেলল।

মিসির আলি বললেন, 'বাংলাদেশে ক্যাট স্কেনের কোনো ব্যবস্থা আছে? আমি এই ছেলের ব্রেইনের একটা ক্যাট স্কেন করাতে চাই।'

'শুধু-শুধু ক্যাট স্কেন কেন করাবেন?'

'পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে, ওর মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নেই।'

'বাংলাদেশে ক্যাট স্কেনার নেই। মাদ্রাজে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে আছে।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে মিসির আলি বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট নেই।'

'জ্বি-না।'

'কাল সকাল দশটার দিকে এসো, পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে একটা দরখাস্ত করে দিই।'

'পাগল হয়েছেন নাকি স্যার?'

'আমি পাগল হব কেন? পাগল হচ্ছ তুমি। তা পুরোপুরি হবার আগেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

'অনেক টাকার ব্যাপার স্যার।'

'তা তো বটেই। আমার কাছেও এত টাকা নেই। একটা ব্যবস্থা করতে হবে। পাসপোর্টটা তো করা থাকুক। চা খাবে নাকি? এস, চা খাওয়া যাক।'

দু' জন চা খেল নিঃশব্দে। চায়ের দোকানে রেডিও বাজছে। মিসির আলি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রেডিও শুনছেন। তাঁর চোখ ছায়াচ্ছন্ন। গানের বিষাদ তাঁকে স্পর্শ করেছে।

'যখন মইরা যাইবারে হাছন
মাটি হৈব বাসা।
কোথায় রইবো লক্ষণ ছিরি,
রঙ্গের রামপাশা।'

মুনির অবাক হয়ে লক্ষ করল, মিসির আলির চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এই মানুষটির প্রতি গভীর মমতা ও ভালবাসায় মুনিরের হৃদয় আর্দ্র হল। পৃথিবীতে ভালো-মানুষের সংখ্যা কম। কিন্তু এই অল্প ক'জনের হৃদয় এত বিশাল, যে, সমস্ত মন্দ মানুষ তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন।

মিসির আলি রুমাল বের করে চোখ মুছে অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। থেমে-থেমে বললেন, 'মানুষের মন বড় বিচিত্র। এই গান আগে কতবার শুনেছি, কখনো এরকম হয় নি। আজ হঠাৎ চোখে পানিটানি এসে এক কাণ্ড! চল, ওঠা যাক।'

মুনির বলল, 'একটু বসুন স্যার, আপনাকে একটা কথা বলি।'

'বল।'

'ঐদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন চেষ্টা করতে, নিজে-নিজে ঐ জগতে যেতে পারি কি না।'

'চেষ্টা করেছিলে?'

'জ্বি। আমি যেতে পারি। ইচ্ছে করলেই পারি।'

'বল কী!'

'হ্যাঁ স্যার। গত তিন দিনে আমি চার বার গিয়েছি। যাওয়াটা খুবই সহজ।'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। মুনির বলল, 'আমি আপনার জন্যে দুটো জিনিস ওখান থেকে নিয়ে এসেছি।'

'কী জিনিস?'

'দুটো ছবি।'

'বল কী তুমি! দেখি!'

মুনির একটা খাম এগিয়ে দিল। মৃদু গলায় বলল, 'বাসায় গিয়ে দেখবেন স্যার। প্লীজ।'

মিসির আলি কৌতূহল সামলাতে পারলেন না। ছবি দুটো দেখলেন। একটি বিয়ের ছবি--বর এবং কনে পাশাপাশি বসে আছে। তাদের ঘিরে আছে আত্মীয়স্বজন। বর মুনির। কনে নিশ্চয়ই বিনু নামের মেয়েটি।

অন্যটি স্বামী-স্ত্রীর ছবি। ওদের কোলে ফুটফুটে একটি শিশু। ছবির উল্টো পিঠে লেখা--

'আমাদের টগরমণি। বয়স এক বছর।'

মুনির বলল, 'এ আমাদের ছেলে। চার বছর বয়সে মারা যায়। নিউমোনিয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা উল্টাপাল্টা চিকিৎসা করেছেন।'

বলতে-বলতে মুনিরের গলা আর্দ্র হয়ে গেল। মিসির আলি দীর্ঘ সময় মুনিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কোনো খবরের কাগজ আন নি?'

'জ্বি-না স্যার। কিছু আনার কথা তখন মনে থাকে না। ছবিগুলো কেমন করে চলে এসেছে, আমি জানি না। ছবিগুলো হাতে নিয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ ঘোর কেটে গেল--দেখি আমি আমার ঘরে বসে আছি। আমার হাতে দুটো ছবি।'

'চল, রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটি।'

'চলুন।'

তারা দু' জন উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গিতে সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত হেঁটে বেড়াল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মিসির আলির মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। একসময় তিনি বললেন, 'তুমি কি এর পরেও নিজাম সাহেবের বাসায় গিয়েছিলে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'চল, আজ যাওয়া যাক।'

'কেন?'

'এম্নি যাব। দেখব। কথা বলব। ভয় নেই, ছবির কথা কিছু বলব না।'

'আমার স্যার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'বেশ, তুমি না গেলে। কীভাবে যেতে হয় আমাকে বল। আমি একাই যাব।'

'স্যার, আমি চাই না ঐ মেয়েটি ছবি সম্পর্কে কিছু জানুক।'

'ও কিচ্ছুই জানবে না।'

মুনির খুব অনিচ্ছার সঙ্গে ঠিকানা বলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

'স্যার, যাই?'

'আচ্ছা, দেখা হবে।'

মুনির ঘর থেকে বের হয়েও বেশ কিছু সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন চলে যাবার ব্যাপারটায় তার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না, আবার না-যাওয়াটাও মনঃপুত নয়।

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন--মনে-মনে বললেন, অদ্ভুত মানবজীবন। মানুষকে আমৃত্যু দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে হয়।

তিনি নিজেও তাঁর জীবন দ্বিধার মধ্যে পার করে দিচ্ছেন। সমাজ-সংসার থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে, আবার লাগে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যে তীব্র বাসনা অনুভব করেন। এক জন মমতাময়ী স্ত্রী, কয়েকটি হাসিখুশি শিশুর মাঝখানে নিজেকে কল্পনা করতে ভালো লাগে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়--এই তো বেশ আছি। বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের মতো আনন্দের আর কী হতে পারে? পুরোপুরি নিঃসঙ্গও তো নন তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির দিকে তাকালে মন অন্য রকম হয়ে যায়। সারি-সারি বই। কত বিচিত্র চিন্তা, কত বিচিত্র কল্পনার কী অপূর্ব সমাবেশ! এদের মাঝখানে থেকে নিঃসঙ্গ হবার কোনো উপায় নেই।

মিসির আলি বইয়ের তাকের দিকে চোখ বন্ধ করে হাত বাড়ালেন। যে-বই হাতে উঠে আসে, সে বইটিই খানিকক্ষণ পড়বেন। এটা তাঁর এক ধরনের খেলা। সব সময়ই এমন একটা বই উঠে আসে, যা পড়তে ইচ্ছে করে না। আবার পড়তে শুরু করলে ভালো লাগে।

আজও তাই হল। কবিতার বই হাতে। এই একটি বিষয়ে পড়াশোনা তাঁর ভালো লাগে না। কবিতার বই সজ্ঞানে কখনো কেনেন নি, এখানে যা আছে সবই নীলু নামের তাঁর এক ছাত্রীর দেয়া উপহার। মেয়েদের এই এক অদ্ভুত সাইকোলজি, উপহার দেবার বেলায় কবিতার বই খোঁজে।

মিসির আলি বইটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন। ইংরেজি কবিতা। কার লেখা কে জানে? অবশ্য নামে কিছু যায়-আসে না। তিনি ভ্রূ কুঁচকে কয়েক লাইন পড়তে চেষ্টা করলেন--

I can not see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,

এর কোনো মানে হয়!

কোনো মানে হয় না, তবু পড়তে এত ভালো লাগে! মিসির আলি পড়তে শুরু করলেন।

১০

অনেকক্ষণ ধরে কে যেন কড়া নাড়ছে।

কড়া নাড়ার ধরনটা অদ্ভুত। দু'টি টোকা দিয়ে থেমে যাচ্ছে, আবার দু'টি টোকা

দিচ্ছে। জানালার পর্দা সরিয়ে বিনু উঁকি দিল। অপরিচিত এক জন মানুষ। রোগা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। এর মাঝে দু'টি চোখ জ্বলজ্বল করছে।

বিনু ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কে?'

লোকটি খুবই কোমল স্বরে বলল, 'আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম মিসির আলি।'

কোমল স্বর খুবই সন্দেহজনক। এ-রকম মিষ্টি গলায় একটা অপরিচিত লোক কথা বলবে কেন?

বিনু বলল, 'বাবা তো একটু বাজার করতে গিয়েছে। আপনি আধ ঘন্টা পরে আসুন না।'

'বাসায় বুঝি তুমি ছাড়া আর কেউ নেই?'

'জ্বি-না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দরজা খুলতে হবে না। আমি এখানেই আধ ঘন্টা অপেক্ষা করি।'

বিনু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মিসির আলি বললেন, 'একটা কাজ কর, জানালা দিয়ে আমাকে একটা দেশলাই দাও।'

'আসুন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।'

মিসির আলি হেসে বললেন, 'এখন বুঝি আমাকে আর দুষ্টু লোক মনে হচ্ছে না?'

'না।'

'নৌকায় যখন ডাকাতি হয়, তখন ডাকাতরা কী করে, জান? আগুন চায়।'

'এটা তো আর নৌকা না।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। মুনির যা বলেছে, তাই--এ মেয়েটির আচার-আচরণে খুব স্বাভাবিক একটি ভঙ্গি আছে। ঠিক সুন্দরী তাকে বলা যাবে না, তবে চেহারা খুব মায়াকাড়া। তার চেয়েও বড় কথা, ছবিতে এই মেয়েটিই কনে হয়ে বসে আছে। এই মেয়েটির বাঁ গালের কাটা দাগটাও ছবিতে নিখুঁত এসেছে।

'বিনু, তুমি বস, তোমার সঙ্গে গল্প করি।'

'আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?'

'মুনির বলেছে। মুনিরকে চেন তো? তোমার আব্বার সঙ্গে কাজ করে।'

'খুব ভালো করে চিনি। আপনি কি ওঁর আত্মীয়?'

'ঠিক আত্মীয় না হলেও খুব চেনা। মাঝে মাঝে অনাত্মীয় লোকজনকেও খুব চেনা মনে হয় না? মুনিরও সে-রকম।'

'আপনি তো খুব সুন্দর করে কথা বলেন।'

'তুমিও খুব সুন্দর করে কথা বল।'

'বাবার কাছে কী জন্যে এসেছেন?'

'ঠিক তোমার বাবার কাছে আমি আসি নি। আমি এসেছি তোমার কাছে।'

বিনু বিস্মিত হয়ে তাকাল। মিসির আলি একটা ছবির উল্টো পিঠ দেখিয়ে বললেন, 'এখানে লেখা আছে, ''আমাদের টগরমনি। বয়স এক বছর।'' এই হাতের লেখাটা কি তোমার?"

বিনু খুবই অবাক হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'বল, তোমার হাতের লেখা?'

'জ্বি। কিন্তু আমি এ-রকম কিছু কখনো লিখি নি।'

'তা আমি জানি।'

'ছবিটা দেখি।'

'উঁহু, ছবিটা এখন দেখাব না। পরে দেখাব। এখন অন্য একটা ছবি দেখ, বিয়ের ছবি। বর-কনে বসে আছে। তাদের ঘিরে আত্মীয়স্বজনরা দাঁড়িয়ে আছে। বর এবং কনের ছবি আমি কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখব। তুমি শুধু অন্যদের ছবিগুলো দেখবে এবং বলবে এদের চেন কি না।'

'তার আগে বলুন, আপনি কে?'

'আমি আমার নাম তো আগেই বলেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি পড়াই। একটা ছোট্ট গবেষণা করছি। গবেষণাটা মুনিরকে নিয়ে।'

'ওকে নিয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু আমাকে এ-সব দেখাচ্ছেন কেন?'

'পরে তোমাকে বলব। তুমি এখন ছবিটা একটু দেখ তো। চিনতে পার এদের?'

'হ্যাঁ, দু' জনকে বাদ দিয়ে সবাইকে চিনি। এরা সবাই আমার আত্মীয়। আমার খালা, আমার ফুপু। এটা হচ্ছে আমার বান্ধবী লিজা। এটা আমার বড় খালার মেয়ে কনক। ইনি আমার ছোট মামা।'

মিসির আলি ছবিটি পকেটে রেখে দিলেন।

বিনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে গিয়ে সে বলল না। নিজেকে সামলে নিল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি কিছু বলবে?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল কি জানি বলতে চাইছিলে?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এটা আমার বিয়ের ছবি। কিন্তু আমার বিয়ে হয় নি। আপনি এই ছবি কোথায় পেলেন?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। বিনু কড়া গলায় বলল, 'আপনি এখন যান। আমি দরজা বন্ধ করে দেব।'

মিসির আলি নিঃশব্দে উঠে এলেন। বিনু জানালার পর্দা ফাঁক করে তাকিয়ে আছে--তার মুখ বিষণ্ণ। চোখে গাঢ় বিষাদের ছায়া। এই বিষাদের উৎস কী, কে জানে?

১১

এখন রাত প্রায় একটা।

আন্দাজে বলছি, কারণ আমার ঘড়ি নেই। রাতের বেলা আন্দাজে সময় ঠিক করি। দিনের বেলা এই অসুবিধা হয় না। বেশির ভাগ মানুষের হাতেই ঘড়ি থাকে। জিজ্ঞেস করলেই সময় জানা যায়।

যে আমার এই লেখা পড়বে, সে বুদ্ধিমান হলে ধরে ফেলবে যে আমি আজেবাজে

কথা লিখে সময় নষ্ট করছি। আসলে তা না। কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।

মিসির আলি সাহেব আমাকে চমৎকার বাঁধান খাতা দিয়েছেন। শুধু তাই না, সঙ্গে খুব দামী একটা কলম। বল পয়েন্ট না, ফাউনটেন পেন। কালির দোয়াতও কিনেছেন। দোয়াতটার দামই সত্তর টাকা। কলমটার দাম কত কে জানে। দুই তিন শ' টাকা তো হবেই। এত দামী কলম, কিন্তু লেখা ভালো না। অর্থাৎ আমি লিখে আরাম পাচ্ছি না।

মিসির আলি সাহেব বলেছেন, আমি যেন রোজ লিখি। প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন লিখি। কিছুই যেন বাদ না দিই। ভ্রমণের ব্যাপারটাই যেন লিখি। ভ্রমণ বলতে তিনি অন্য জগতে যাবার ব্যাপারটা বোঝাচ্ছেন। তিনি নিজে এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন কি করেন না, তা আমি এখনো বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বিশ্বাস করেন, আবার মাঝে–মাঝে মনে হয় করেন না। পুরো ব্যাপারটাই এক জন নিঃসঙ্গ যুবকের কল্পনা ধরে নিয়েছেন।

আমি তাঁকে একটি চিঠি এবং দুটি ছবি এনে দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কথাও বলছেন না। আমি একবার ছবিটা চাইলাম। তিনি বললেন, 'পরে পাবে।'

তিনি যে চুপচাপ বসে আছেন তাও মনে হয় না। আমার ব্যাপারে তিনি খুলনা গিয়েছিলেন, এটা হঠাৎ জানতে পারি। সেখান থেকে তিনি কী জানলেন, আমি জানি না।

ফুলেশ্বরীর শ্বশুরবাড়িতেও তিনি গিয়েছিলেন। আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে মনে হয়। আমি নিজে যা জানি, সবই তাঁকে বলেছি। এর বেশি তিনি কী জানতে চান কে জানে। লোকটির ধৈর্য অসীম। মমতাও অসীম। তাঁর মমতার নানান পরিচয় পেয়েছি। কঠিন ঋণে তিনি আমাকে আবদ্ধ করেছেন। আমার পক্ষে ঋণমুক্ত হবার কোনো পথ আছে কি না আমি জানি না। ঋণমুক্ত হতে চাইও না। কিছু কিছু মানুষের কাছে ঋণী থাকতে ভালো লাগে। মিসির আলি তেমন এক জন মানুষ।

আবারো আজেবাজে কথা বলছি। কি করব, আমি তো আর লেখক নই, যে, গুছিয়ে ঘটনার পর ঘটনা সাজাব। আমি তা পারি না। লেখক ছাড়া অন্য কেউই বোধ–হয় পারেন না।

যাই হোক, মূল ব্যাপারে ফিরে আসি। আমি এখন প্রায় এক শ' ভাগ নিশ্চিত যে, আমার পাশাপাশি দু'টি জীবন চলছে। এক জীবনে আমার বাবা শৈশবে মারা গেছেন। প্রবল দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বর্তমানে এই অবস্থায় আছি। অসহায় নিঃসঙ্গ এক জন মানুষ।

অন্য জীবনটি চমৎকার! এই জীবনে বাবা বেঁচে আছেন। আমি বড় কোনো চাকরি কিংবা ব্যবসা করছি, এখনো ঠিক জানি না। বিয়ে করেছি। জীবনটা বেশ সুখের বলেই মনে হচ্ছে। এই জীবনটাকে আমি স্বপ্নজীবন নাম দিচ্ছি বোঝার সুবিধের জন্যে। স্বপ্ন–জীবনটাও পৃথিবীর মধ্যেই। কারণ, সেখানেও আমি আকাশে চাঁদ দেখছি। দুটি পাশাপাশি জীবন কিভাবে চলছে? দুটি কি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ? দুটি পৃথিবী দুটি চাঁদ? সব মানুষই দু' জন করে? এইসব প্রশ্নের আমি কোনো কূল–কিনারা পাই না। কাজেই খুব বেশি ভাবিও না। চিন্তা–ভাবনার দায়িত্ব আমি মিসির আলি সাহেবের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

আমি লক্ষ করেছি যে, এখন আমি এ জগৎ থেকে স্বপ্ন–জগতে খুব সহজেই

যেতে পারি। নিয়মটা খুব সহজ। নিজেকে প্রথমে খুব ক্লান্ত করে নিতে হয়। উপবাস এবং পরিশ্রম এই দুটি জিনিস একত্রে চালিয়ে যাবার পর চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন-জগৎটির কথা ভাবলেই হয়।

একবার স্বপ্ন-জগতে চলে যাবার পর সেই জগৎটাকে সত্যি মনে হয়। বর্তমানে যে জীবন যাপন করছি, তাকে মনে হয় মিথ্যা জীবন। কোনটি সত্যি কে জানে? প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা বলতেন--জীবনটাই একটা মায়া। আসলেই বোধহয় তাই। সবটাই বোধহয় মায়া। আমার এখন এ-সব জানতে ইচ্ছে করে না। যে-কোনো একটি জীবনে আমি স্থায়ী হতে চাই।

যদি এটা এক ধরনের অসুখ হয়, তাহলে আমি চাই যেন অসুখটা সেরে যায়। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে চাই। মুক্তি চাই। পরিপূর্ণ মুক্তি।

আজ এর বেশি কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। এখন তৈরি হব ভ্রমণের জন্যে। অদ্ভুত এক ভ্রমণ। এই জীবন ছেড়ে অন্য এক জীবনে।

মুনির খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। বাতি নিভিয়ে সিগারেট ধরাল। মনে-মনে বলল--ভ্রমণের প্রস্তুতি। যাত্রা হবে শুরু। এ-রকম যদি হত—ওয়ান ওয়ে জার্নি, আর ফিরে আসতে হবে না--তাহলে কেমন হত? স্বপ্ন-জীবনটি কি খুবই সুখের? মৃত্যু ঐ জীবনেও হানা দিয়েছে। টগরের মৃত্যু হল। বাবা-মার কাছে কত তীব্রই না ছিল সেই শোক! সে এখন বুঝতে পারছে না, কিন্তু ঐ জীবনের মুনির কী গভীর শোক পেয়েছে, তা সে রক্তের মধ্যে অনুভব করে। শোক এবং শোক, চারদিকেই শোক। জাপানি একটি কবিতায় আছে না?

'বল দেখি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই?
ভাবিলাম বনে যাব
তাপিত হিয়া জুড়াব
সেখানেও অর্ধ-রাত্রে
কাঁদে মৃগী কম্প গাত্রে।।'

মুনির সিগারেট ফেলে নিজেকে তৈরি করল। মুহূর্তে ঘরের চেহারা পাল্টে গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়, তারা কোথায় যেন বেরুচ্ছে। ঐ তো বিনু। আশ্চর্য, কী সুন্দর লাগছে বিনুকে! অসম্ভব সুন্দর! বিনুর চুলগুলো পিঠময় ছড়ান। এ-রকম খোলা চুলে সে কোথায় যাচ্ছে! নাকি বিনু যাচ্ছে না, সে একাই যাচ্ছে? একটি কাজের লোক বড়-বড় দুটি স্যুটকেস নিয়ে নামছে। তারা নিশ্চয়ই দূরে কোথাও যাচ্ছে। ঘরে দিনের আলো। ক'টা বাজছে কে জানে। মুনির হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল--দশটা পনের। ঘড়ির ডায়াল সবুজ রঙের। বাহ্, ইন্টারেস্টিং তো! এটা তো স্বপ্ন। স্বপ্নে তো রঙ দেখার কথা নয়। সে রঙ দেখছে কেন? কে বলেছিল, স্বপ্নে রঙ দেখার কথা নয়? মনে পড়ছে না। নামটা মনে পড়ছে না। ম দিয়ে শুরু। মিহির? মুনির? না না, মিসির। মিসির আলি। মিসির আলি বলেছেন--ভ্রমণের সময় খবরের কাগজ হাতে নেবে। খবরের কাগজ হাতে নিতে হবে কেন? মিসির আলি বলেছেন, একটা খবরের কাগজ হাতে নেবে। কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। কেন বললেন এ-রকম কথা! বিনু কেমন যেন বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছে।

'টগর। টগর।'

মুনির চমকে উঠল। টগরকে কেন ডাকছে? টগর চার বছর বয়সে মারা গেল না? বিনু কি ভুলে গেছে? এত বড় একটা ঘটনা কি ভোলার কথা! অবশ্যি ভোলাটা অস্বাভাবিকও নয়। এই তো সে নিজেই অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছে। কি কি যেন তাকে বলেছিলেন মিসির আলি। এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না।

'টগর। আমি কিন্তু খুব রাগ করছি। আর এক বার মাত্র ডাকব। এর মধ্যে তুমি যদি আস ভালো কথা, না এলে তোমাকে ছাড়াই রওনা হব।'

মুনির অবাক হয়ে দেখল, টগর এসেছে। আট–ন' বছর বয়সের চশমাপরা একটা ছেলে। টগর বলল, 'আমি যাব না, মা।'

বিনু বলল, 'খুব ভালো কথা, থাক তুমি।'

বিনু তরতর করে নেমে যাচ্ছে। টগর হাসিমুখে মুনিরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তার মানে কি টগর বেঁচে আছে? চার বছর বয়সে ও তাহলে মারা যায় নি? এটা কোন জীবন? অন্য আরেকটা? এর মানে কী?

মুনিরের নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। সঙ্গে–সঙ্গে ঘোর কেটে গেল। সে আছে তার পরিচিত জায়গায়। ভ্রমণ শেষ হয়েছে।

মুনির বাতি জ্বালাল। খাতা খুলে লিখল, 'মানুষের জীবন দুটি নয়। অনেক। হয়তো–বা অসংখ্য।'

ক্লান্তিতে খাতার ওপরই মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত সেই ঘুম ভাঙল না। কত বিচিত্র স্বপ্ন দেখল ঘুমিয়ে–ঘুমিয়ে! কখনো মনে হচ্ছে সে মেঘে–মেঘে ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার কখনো–বা তলিয়ে যাচ্ছে গভীর অতলে। কী গাঢ় নীল সেই পানি। চারদিকে শব্দহীন সময়। কী অসহ্য নীরব। এই নীরবতার মধ্যেও কে যেন নিচু গলায় তাকে ডাকছে। বিনু ডাকছে নাকি? এটা কি বিনুর গলা? আহ্! কী সুন্দর করেই না সে ডাকছে! আবার সব চুপচাপ। অসহ্য নীরবতা। মুনির স্বপ্নের মধ্যেই কাঁদছে। চেঁচিয়ে–চেঁচিয়ে বলছে––আমাকে মুক্তি দাও। কিন্তু তার চিৎকারেও কোনো শব্দ হচ্ছে না। কী অদ্ভুত অবস্থা!

তার ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। প্রথম খানিকক্ষণ বুঝতেই পারল না, সে কোথায় আছে। কোন জগতে! সে ঠিক করল, আজ অফিসে যাবে না। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। দুপুরবেলার দিকে যাবে মিসির আলির কাছে। এমনি খানিকক্ষণ গল্প করবে। দুপুরবেলা বা দিনের আলোয় তাঁর কাছে কখনো যাওয়া হয় নি। দিনের আলোয় লোকটিকে দেখতে কেমন দেখায় কে জানে! তবে দুপুরবেলা ওঁকে হয়তো পাওয়া যাবে না। ক্লাসে থাকবেন কিংবা লাইব্রেরিতে থাকবেন।

মিসির আলি ঘরেই ছিলেন, অবাক হয়ে বললেন, 'অসময়ে তুমি, ব্যাপার কি বল তো? অফিসে যাও নি?'

'জ্বি–না। আপনি ইউনিভার্সিটিতে যান নি?'

'না। আজ বৃহস্পতিবার না? বৃহস্পতিবারে ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকে।'

'কী করছেন স্যার?'

'রান্না করছি। রোজ–রোজ হোটেলে খাওয়া ভালো লাগে না।'

'কী রান্না করছেন?'

'নতুন ধরনের রান্না, আমিই তার আবিষ্কারক। নাম হচ্ছে মিসির মিকচার। চাল, ডাল এবং আলু একসঙ্গে মিশিয়ে দু' চামচ ভিনিগার, এক চামচ সয়া সস, একটুখানি লবণ, দুটো কাঁচা লঙ্কা এবং আধা চামচ সরিষা বাটা দিয়ে সেদ্ধ করতে হয়। সেদ্ধ হয়ে যাবার পর এক চামচ বাটারওয়েল দিয়ে দমে দিতে হয়--অপূর্ব একটা জিনিস নামে। খেয়ে দেখ।'

জিনিস যেটা নামল, তার চেহারা দেখলে খেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু স্বাদ সত্যি চমৎকার। মুনির অবাক হয়ে গেল।

'কি, কেমন লাগছে?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'আরো কিছু বিশেষণ দিয়ে বল। শুধু ভালো, এর বেশি কিছু না?'

'চমৎকার স্যার।'

'এখন বল, তুমি যে ভ্রমণে যাচ্ছ, সেখানে কখনো খাওয়াদাওয়া করেছ? চট করে বলতে হবে, না-ভেবে বল।'

'পানি খেয়েছি।'

'পানিতে হবে না, স্বাদ আছে এমন কিছু।'

'মনে পড়ছে না স্যার।'

'এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করবে।'

'কেন?'

'স্বপ্নে আমরা প্রায়ই প্রচুর খাওয়াদাওয়া করি। তাতে কিন্তু কোনো স্বাদ থাকে না।'

'আপনি এখনো স্বপ্ন ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছি। তবে তুচ্ছ স্বপ্ন ভাবছি না।'

'সব স্বপ্নই তো তুচ্ছ।'

'না, তা না। তা ছাড়া স্বপ্নকে তুচ্ছ করাও খুব মুশকিল। ফ্রয়েড সাহেব ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রীম লিখে স্বপ্নের মহিমাকে খর্ব করেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্য ''জাং'' পরবর্তী সময়ে ভিন্ন কথা বলেছেন।'

'কি বলেছেন?'

'ঐ সব থিওরি তোমার ভালো লাগবে না। তারচে বরং তোমার কথা শুনি। যা যা করতে বলেছিলাম, করেছ তো? সব কিছু লিখছ তো?'

'লিখছি।'

'খুব খুঁটিয়ে লিখবে। কোনো কিছু বাদ দেবে না।'

'কি হবে স্যার এসব দিয়ে?'

'হয়তো কিছু হবে না। তাতে কি? কই, আমার সিগারেট এনেছ?'

মুনির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। মিসির আলি হেসে ফেললেন।

১২

বিনু বলল, 'বাবা, তুমি ঐ ভদ্রলোককে আর তো আনলে না।'

নিজাম সাহেব বললেন, 'মুনিরের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না?'

'হবে না কেন? রোজই তো হচ্ছে।'

'আজ একবার তাঁকে নিয়ে আসতে পারবে?'

'কেন?'

'একটা দরকার আছে বাবা।'

'কি দরকার?'

'আছে একটা দরকার। তুমি অবশ্যি আজ তাঁকে সঙ্গে করে আনবে।'

'রাতে খেতে বলব?'

'হুঁ, বলতে পার।'

বিনুর ভাবভঙ্গি নিজাম সাহেব ঠিক বুঝতে পারলেন না। ক' দিন আগেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে-আগে বিনু তাঁর ঘরে এল। মশারি গুঁজে দিল। বাতাস যাতে ঢুকতে পারে সে জন্যে জানালার পর্দা উঠিয়ে দিল। নিজাম সাহেব বললেন, 'কিছু বলবি?'

'না বাবা, কিছু বলব না।'

'তোকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাস।'

'না, চাই না। তুমি যদি কিছু বলতে চাও, বল। আমি শুনব।'

'আমি আবার কী বলব? ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'তাহলে ঘুমাও। বাতি নিভিয়ে দিই?'

'দে।'

বিনু বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই সে মৃদু স্বরে বলল, 'আমার যে বিয়ে তুমি ঠিক করেছ, ওতে আমার মত নেই। বিয়ে ভেঙে দাও।'

'কি বললি!'

বিনু উত্তর দেবার জন্যে দাঁড়াল না, ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে এল। নিজাম সাহেব পেছনে-পেছনে উঠে এলেন। বিনু ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। তিনি বেশ ক' বার ডাকলেন। বিনু সাড়া দিল না।

ভোরবেলায় তিনি বিনুকে খুব স্বাভাবিক দেখলেন। যেন কিছুই হয় নি। আগের মতো হাসিখুশি। তাঁর বুক থেকে পাথর নেমে গেল। তাঁর মনে হল বিনু যা করেছে, তা সাময়িক অস্থিরতার কারণে। অস্থিরতা কেটে গেছে।

বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বরপক্ষীয় লোকজন বিয়ের কার্ড ছাপাতে দিয়েছে। এ সময় নতুন কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না-হলেই ভালো। বিনু তেমন মেয়ে নয়। অবুঝের মতো কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু নিজাম সাহেবের ভয় কাটে না। চমৎকার ছেলে পাওয়া গেছে। ডাক্তার। স্বভাব-চরিত্র ভালো--নম্র-ভদ্র ছেলে। এই বিয়ে ভেঙে গেলে এ-রকম আরেকটি ছেলে পাওয়া মুশকিল হবে।

সন্ধ্যাবেলা নিজাম সাহেব একা-একা ফিরলেন। বিনু কিছু বলল না। নিজাম

সাহেব জামা খুলতে–খুলতে নিজ থেকেই বললেন, 'মুনির আজ আসেনিরে মা। দেখি, আগামীকাল যদি আসে, নিয়ে আসব।'

বিনু চুপ করে রইল। রাতে খেতে বসে নিজাম সাহেব দেখলেন, অনেক আয়োজন। তিনি শুধু মাছ কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে মুরগিও আছে।

'মুরগি কোথায় পেলি রে?'

'আকবরের মা'কে দিয়ে আনিয়েছি।'

'ও এসেছে নাকি?'

'হুঁ।'

'যাক, ভালো হয়েছে, এখন আর একা–একা থাকতে হবে না।'

'হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে।'

'অবশ্যি কয়েকটা দিন। তোর খালারাও তো চলে আসবে। বিয়েশাদির ব্যাপার, ওদেরই তো এখন দায়িত্ব।'

কথাটা বলে নিজাম সাহেব আড়চোখে তাকালেন। মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলেন। তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না।

'তুইও বসে যা। একসঙ্গে খাই।'

'আমার খিদে নেই বাবা, তুমি খাও।'

'খিদে নেই কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

'না, শরীর ঠিকই আছে।'

রাতে বিনু বাবার মশারি খাটাতে এসে শান্ত গলায় বলল, 'কাল যদি ঐ ভদ্রলোক আসেন, তাহলে তাকে মনে করে নিয়ে এসো।'

নিজাম সাহেব বিস্ময় গোপন করে বললেন, 'কোনো দরকার আছে?'

'না, এম্নি।'

'আচ্ছা, বলব।'

পরদিনও মুনির অফিসে এল না। নিজাম সাহেব একা–একা ফিরলেন। বিনু বলল, 'উনি আজও অফিসে আসেন নি, তাই না?'

'হুঁ, তাই।'

'ওঁর ঠিকানা জানা আছে?'

'না।'

বিনু আর কিছু বলল না। নিজাম সাহেব রাতে খেতে বসে দেখলেন, আজও অনেক আয়োজন। খাবার শেষে পায়েসও আছে। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ছেলেটাকে এ বাড়িতে আনা বোধহয় ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। ভুলটা কোথায়, তা তিনি ধরতে পারছেন না।

'বিনু।'

'বল বাবা।'

'আমাদেরও তো কার্ডটার্ড ছাপাতে হয়।'

'ছাপাতে হলে ছাপাও।'

'না, মানে ··· ওই দিন তুই হঠাৎ বললি––মানে ওই বিয়ের ব্যাপারটা, মানে···'

'পায়েস নাও বাবা। পায়েসটা ভালো হবার কথা।'

'খাওয়া বেশি হয়ে গেছে। রোজ এ-রকম খাওয়া হলে ব্লাডপ্রেসার হয়ে যাবে।'

'তোমার কিছুই হবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে খাও তো!'

নিজাম সাহেবের বুকের পাথর নেমে গেল। তিনি তার পুরনো, পরিচিত মেয়েকে খুঁজে পেলেন। এই লক্ষী মেয়ে সারাজীবন কাউকে যন্ত্রণা দেয় নি, এখনো দেবে না।

রাতে মশারি গুঁজতে এসে বিনু চেয়ার টেনে পাশে বসল। নিজাম সাহেব নিদারুণ আতঙ্ক বোধ করলেন। একবার ভাবলেন--ঘুমিয়ে পড়েছেন এমন ভাব করবেন, ডাকলে সাড়া দেবেন না।

'বাবা।'

'কি?'

'আগামীকাল তুমি যে করেই হোক, ভদ্রলোকের ঠিকানা বের করবে।'

'কেন?'

'আমি মিসির আলি নামে এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'সে আবার কে?'

'তুমি চিনবে না, উনি এক বার এ-বাড়িতে এসেছিলেন। মুনির সাহেবকে চেনেন।'

'তুই কি বলছিস, আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না বাবা। উনি একটা অদ্ভুত ছবি নিয়ে এসেছিলেন। মনে হয় আমার বিয়ের ছবি।'

'কি আবোল-তাবোল বকছিস! তোর বিয়ের ছবি মানে? তোর বিয়েটা হল কবে?'

নিজাম সাহেব উত্তেজনায় মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। কপালের চামড়ায় গভীর ভাঁজ।

'ব্যাপারটা কী, আমাকে গুছিয়ে বল।'

'আমি জানলে তো গুছিয়ে বলব। আমাকে জানতে হবে না? আমার মনে হয় উনি জানেন।'

'কি বারবার উনি-উনি করছিস, উনিটা কে?'

'মিসির আলি সাহেব।'

'কী মুশকিল, মিসির আলিটা কে?'

'একবার তো বলেছি বাবা, মুনির সাহেবের বন্ধু।'

সে-রাতে নিজাম সাহেবের ভালো ঘুম হল না। বারবার জেগে উঠলেন। শেষরাতের দিকে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যেন প্রকাণ্ড একটা মাকড়সার পেটের সঙ্গে তিনি সেঁটে রয়েছেন। মাকড়সাটা তাঁকে পেটে নিয়ে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। ঐ মাকড়সার পেছনে-পেছনে আরো কয়েকটা মাকড়সা তাঁর দখল নেবার চেষ্টা করছে। বড় মাকড়সাটার সঙ্গে পারছে না। মাকড়সাটার গা থেকে পিচ্ছিল কি একটা বের হচ্ছে। তাঁর গা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। তিনি ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কী ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন!

১৩

দরজায় খুব আলতো করে কে যেন হাত রাখল। মিসির আলি কেরোসিনের চুলোয় চা বসিয়েছেন। সেখান থেকেই বললেন, 'কে?' কোনো রকম জবাব পাওয়া গেল না। কেউ দরজার কড়াও নাড়ছে না। মিসির আলি উঠে এলেন। দরজার ও-পাশে একজন-কেউ আছে। কড়া না-নাড়লেও তা বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব দুর্বল নয়, অনেক কিছুই সে ধরতে পারে।

হয়তো কোনো ভিখিরি। কড়া নাড়তে সঙ্কোচ বোধ করছে, কিংবা এমন কেউ, যে ঠিকানা গুলিয়ে ফেলেছে। মিসির আলি দরজা খুলে চমকে উঠলেন--নীলু দাঁড়িয়ে আছে। হালকা বেগুনি রঙের শাড়ি। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই সে নানান জায়গায় ঘুরছে। তার শান্তমুখে শ্রান্তির ছায়া।

'কেমন আছ নীলু?'

'ভালো। ভেতরে আসব?'

'কী আশ্চর্য! কেন আসবে না?'

'আমি ভাবছিলাম, আপনি আমাকে ঘরেই ঢুকতে দেবেন না।'

'এ-রকম মনে করার কোনো কারণ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। আপনি আমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠিকানা বদল করেছেন। ইউনিভার্সিটিতেও যান না।'

'ইউনিভার্সিটিতে যাই না, কারণ আমি এক বছরের ছুটি নিয়েছি। এস, ভেতরে এসে বস।'

নীলু ভেতরে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'আর কেউ নেই?'

'আর কে থাকবে? তুমি কি ভেবেছিলে বিয়ে করে, সংসার পেতে বসেছি?'

'না, তা ভাবি নি। আপনি গৃহী মানুষ নন।'

'তাহলে আমি কি সন্ন্যাসী?'

'না, তাও না।'

'নীলু, তুমি আরাম করে বস--আমি চা বানাচ্ছিলাম। চা শেষ করে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'চা-টা আমি বানিয়ে দিই?'

'দাও। সব হাতের কাছেই আছে--হাত বাড়ালেই পাবে।'

নীলু শীতল গলায় বলল, 'হাতের কাছে থাকলেই হাত বাড়ালে সব কিছু পাওয়া যায় না।'

মিসির আলি এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সময় কথার পিঠে কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না। কিছুতেই সহজ হতে পারেন না, অথচ তার সঙ্গেই সম্পর্কটা সবচে সহজ হওয়া উচিত ছিল।

নীলু চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু না বলে বাড়িটা বদলালেন কেন?'

'নানান ঝামেলায় বলা হয়ে ওঠে নি।'

'বাজে কথা বলবেন না। আপনি ইচ্ছে করেই এটা করেছেন। এবং কেন করেছেন তাও জানি।'

'কেন করেছি?'

'লোকলজ্জার ভয়ে। আমার মতো একটা অল্পবয়সী মেয়ে আপনার মতো আধবুড়োর পেছনে দিন-রাত ঘুরঘুর করে, এটা আপনার ভালো লাগে নি। সারাক্ষণ ভেবেছেন, লোকে না-জানি কি বলছে।'

'লোকে কি বলছে না-বলছে, তা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না।'

'তাও অবশ্যি ঠিক। আপনি মাথা ঘামান বড়-বড় বিষয় নিয়ে।'

মিসির আলি আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছি, বুঝলে নীলু। একটা মানুষের অনেক ক'টা জীবন থাকার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।' নীলু বলল, 'এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগলেও শোন--এই যে তুমি এসেছ আমার কাছে, এটা ঘটছে এই জীবনে। অন্য এক জীবনে আমি হয়তো গিয়েছি তোমার কাছে। সেই জীবনে আমি হয়তো তোমার পেছনে-পেছনে ঘুরছি, আর তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'আপনি কি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

'আমি কথার কথা বলছি নীলু।'

নীলু থমথমে গলায় বলল, 'আপনার ঠিকানা বের করার জন্যে আমি যে কী কষ্ট করেছি, তা যদি আপনি জানতেন····।'

'জানলে কী হত?'

'না--কী আর হত? কিছুই হত না।'

নীলুর চোখ ছলছল করছে। মিসির আলি ভয় করছেন, হয়তো কেঁদে ফেলবে। তবে এই মেয়েটি শক্ত মেয়ে, সহজে কাঁদবে না। নিজেকে সামলে নেবে।

হ্যাঁ, তাই হচ্ছে। নীলু নিজেকে সামলে নিচ্ছে। সে সহজ গলায় বলল, 'চায়ে চিনি হয়েছে তো?'

মিসির আলি হাসলেন। কী সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে!

১৪

বিনু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি!'

মুনির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল। নিচু গলায় বলল, 'স্যার কি বাসায় নেই?'

'বাসায় থাকবেন কেন? এখন তো ওঁর অফিসে থাকবার কথা। তাই না?'

'ও, আচ্ছা--হ্যাঁ।'

'আপনি অফিসে যান নি?'

'না। আমি তাহলে যাই।'

'বসতে চাইলে বসুন।'

মুনির বারান্দায় চেয়ারটায় বসে পড়ে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। টানা টানা গলায় বলল, 'পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম···।'

'চা খাবেন, না লেবু দিয়ে সরবত বানিয়ে দেব? আপনি খুব ক্লান্ত, সেই জন্যে বলছি।'

'না, কিছু লাগবে না।'

বিনু ভেতরে চলে গেল। আবার ফিরে এল লেবুর সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে।

'আমাদের তো ফ্রীজ নেই, এই জন্যে খুব ঠাণ্ডা হবে না। গরম সরবত।'

মুনির হেসে ফেলল। বিনু বলল, 'আমার মনে হয়, আপনি আমাকে কিছু বলতে এসেছেন। বলে ফেলুন।'

'না, এম্নি এসেছি।'

'আপনি এম্নি আসেন নি। কি বলতে চান আপনি বলুন। আমি রাগ করব না।'

মুনির ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমি আপনাকে চিনি।'

'তা তো চিনবেনই। না-চেনার তো কথা না। আগে এক দিন এসেছিলেন। আমার বাবাকে এত ভালো করে চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'

'তার চেয়েও ভালোভাবে চিনি।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'কীভাবে বলুন তো?'

'আপনি যখন খুব ছোট, তখন কী কী করতেন সব আমি বলতে পারব।'

'বেশ তো, দু'-একটা বলুন, আমি শুনি।'

'আমি মীনার কথা জানি। মীনা আপনার খুব বন্ধু ছিল না?'

'কে বলেছে আপনাকে মীনার কথা?'

মুনির চুপ করে রইল।

'বলুন, কে মীনার কথা আপনাকে বলেছে?'

মুনির একবার ভাবল বলে ফেলে--বিনু, ও সব কথা আমি তোমার কাছ থেকেই শুনেছি। এক সময় তুমিই আমাকে বলেছ। বিয়ের পর রাত জেগে তুমি কত গল্প করতে। কিন্তু এই মেয়েটিকে এ-সব বলা অর্থহীন। সে কিছুই বুঝবে না।

'কি ব্যাপার, চুপ করে আছেন?'

মুনির নিচু স্বরে বলল, 'আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো আমাকে দেখে কি আপনার খুব চেনা-চেনা মনে হয় নি?'

'না। চেনা-চেনা মনে হবে কেন? চেনা মনে হবার কি কোনো কারণ আছে?'

'জ্বি-না। আচ্ছা, আমি উঠি।'

মুনির উঠে দাঁড়াল। বিনু বলল, 'আপনি আর এ-রকম একা-একা এ বাড়িতে আসবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'যদি কখনো আসতে চান, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

'ভয় নেই, আমি আর আসব না।'

'আপনি আপনার এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। এ-সব করবেন না।

বাবা আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আপনার কাণ্ডকারখানা শুনলে বাবা মনে খুব কষ্ট পাবেন। আমি নিজে বাবাকে এ-সব কখনো বলব না। আপনিও বলবেন না।'

মুনির হেসে ফেলল। হঠাৎ তার হাসি এসে গেল, কারণ বিনুর ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। রাগী-রাগী গলায় অনেকক্ষণ কথা বলবার পর, হঠাৎ তার রাগ পড়ে যায়। চোখে পানি এসে যায়। এখনো বিনুর চোখে পানি আসছে। আসতেই হবে।

'আপনি হাসছেন কেন?'

'হাসছি, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে এত সব কঠিন কথা বলার জন্যে আপনার খুব কষ্ট হবে। আপনি কাঁদতে শুরু করবেন।'

'আপনি বেরিয়ে যান।'

মুনির বের হয়ে এল। বিনু সত্যি-সত্যি কাঁদতে বসল। তার খুব খারাপ লাগছে।

১৫

মিসির আলি একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি গত কয়েক দিন ধরেই চেষ্টা করছেন তাঁর সেই থিওরি গুছিয়ে ফেলতে। পারছেন না। লিখতে গিয়ে সব আরো কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে যা ভাবছেন, তা লিখতে পারছেন না। সারা দুপুর বসে বসে তিনি তাঁর থিওরির পয়েন্টগুলো লিখলেন। সেগুলো কেটে ফেলে আবার লিখলেন। সন্ধ্যাবেলা সব কাগজপত্র ফেলে দিয়ে নতুন খাতা কিনে আনলেন। কলম কিনলেন। তিনি লক্ষ করেছেন, খাতা-কলম বদলে ফেললে মাঝে-মাঝে তরতর করে লেখা এগোয়। তাই হল। রাতের বেলা বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠা লিখে ফেললেন। রচনার নাম দিলেন--

একজীবন : বহুজীবন

একটি মানুষের কয়েকটি জীবন থাকে? তাই তো মনে হয়। এক জন শিশু জন্মায়, বড় হয়, মৃত্যু হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকাল একটি ধারায় প্রবাহিত হয়। সেই ধারায় সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার নানান ঘটনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনের ধারা একটি না হয়ে কি অনেকগুলো হতে পারে না? ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। মনে করি, মুনির নামের একটি ছেলে বড় হচ্ছে। শৈশবে তার পিতৃবিয়োগ হল। সেই মুহূর্ত থেকে যদি তার জীবন দুটি ভাগে ভাগ হয়, তাহলে কেমন হয়? একটি ভাগে ছেলেটির পিতৃবিয়োগ হল, অন্য ভাগে হল না--বাবা বেঁচেই রইলেন। দুটি জীবনই সমানে প্রবাহিত হতে লাগল। তবু এক জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের কোনো যোগ রইল না। কারণ এই দুটি জগতের মাত্রা ভিন্ন।

দুই ভিন্ন মাত্রায় দুটি জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। এক জীবনে ছেলেটি সুখী—অন্য জীবনে নয়।

এখন এই দুটি জীবনের ব্যাপারটাকে আরো বিস্তৃত করা যাক। ধরা যাক, জীবন দুটি নয়। অসংখ্য, সীমাহীন। 'প্রকৃতি' একটি মানুষের জীবনে যতগুলো ভেরিয়েশন হওয়া সম্ভব, সবগুলোই পরীক্ষা করে দেখছে। সবই সে চালু করেছে।

অসীম ব্যাপারটা এমনই যে, এ-পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যেই অসীম সংখ্যক

জীবনধারা চালু করতে পারে। কারণ অসীম সংখ্যাটির এমনই মাহাত্ম্য যে, সে অসীমসংখ্যক অসীমকেও ধারণ করতে পারে। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্ট অসীমের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'হিলবার্ট' হোটেলের সমস্যায়। এই হোটেলটির সবচে' বড়ো গুণ হচ্ছে, হোটেলের প্রতিটি কক্ষ অতিথি দিয়ে পূর্ণ হবার পরও যত খুশি অতিথিকে ঢোকান যায়। এর জন্যে পুরনো অতিথিদের কোনো অসুবিধে হয় না। কারো কক্ষে দু' জন অতিথি ঢোকানোর প্রয়োজন হয় না। এটা সম্ভব হয় অসীম সংখ্যাটির অদ্ভুত গুণাবলীর জন্যে। মানুষ তার প্রচুর জ্ঞান সত্ত্বেও অসীমকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। সবচে' সহজ ব্যাখ্যাটি হচ্ছে--অসীম হচ্ছে বিরাট বই, যার শুরুর পাতা এবং শেষের পাতা বলে কিছু নেই।

এখন কথা হচ্ছে, প্রকৃতি কেন একটি মানুষের জন্যে অসংখ্য জীবনের ব্যবস্থা করবে? প্রকৃতির স্বার্থ কী?

প্রকৃতির একটি স্বার্থের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি, সেটি হচ্ছে--কৌতূহলের সঙ্গে সে একটি পরীক্ষা চালাচ্ছে। তার চোখের সামনে মানবজীবনের, সেই সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও, অসংখ্য ভেরিয়েশন। প্রতিটিই চলছে স্বাধীনভাবে, একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো যোগ নেই, কারণ প্রতিটিই প্রবাহিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়।

'প্রকৃতি' না বলে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করলে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়। ঈশ্বর নামের কোনো মহাশক্তিধর, যিনি অসীমকে ধারণ করতে পারেন, কারণ তিনি নিজেই অসীম--সেই তিনিই অসীম নিয়ে খেলছেন।

কাজেই আমরা দেখছি মুনির নামের ছেলেটির অসংখ্য জীবন। এক জীবনে সে বিনুকে বিয়ে করে, অন্য জীবনে বিনুকে বিয়ে করতে পারে না। এক জীবনে তার এবং বিনুর একটি ছেলে হয়, ছেলেটি চার বছর বয়সে মারা যায়। অন্য জীবনে ছেলেটি বেঁচে থাকে। কত বিচিত্র রকমের পরিবর্তন! এবং প্রতিটি পরিবর্তনকেই প্রকৃতি গভীর আগ্রহে এবং গভীর মমতায় দেখছে।

প্রকৃতির নিয়ম কঠিন এবং ব্যতিক্রমহীন, তবু মাঝে-মাঝে হয়তো কিছু-একটা হয়। সামান্য এদিক-ওদিক হয়। জীবনের এক ধারায় মানুষ প্রকৃতিরই কোনো-এক বিচিত্র কারণে অন্য ধারায় এসে হকচকিয়ে যায়।

এ-রকম ঘটনা অতীতে ঘটেছে। এই মুহূর্তে আমি একটি উদাহরণ দিতে পারি। খুঁজলে নিশ্চয়ই আরো প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

উদাহরণটি আমেরিকার আরিজোনা শহরের। আঠার শ' চব্বিশ সালের ঘটনা। ঘটনাটি স্থানীয় মেথডিস্ট চার্চের নথিতে অন্তর্ভুক্ত। বেশ কিছু অনুসন্ধানী দল ঘটনাটি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা অতীতে করেছে। এই ঘটনা বিশ্বে সংঘটিত অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটি বলে এখনো মনে করা হয়।

ডেভিড ল্যাংম্যান আরিজোনা শহরের এক জন সাধারণ ছুতোর মিস্ত্রী। ছুতোরের কাজ করে জীবনধারণ করেন। সরল সাধাসিধে মানুষ। তবে অতিরিক্ত মদ্যপানের বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে-মাঝে পুরো মাতাল হয়ে ঘরে ফিরতেন। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের ওপর অত্যাচার করতেন। নেশা কেটে গেলেই আবার ভালোমানুষ।

ভদ্রলোক চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। যথারীতি তাঁকে কফিনে ঢুকিয়ে গোর

দেওয়া হয়। এর প্রায় চার বছর পরের ঘটনা। এক রাতে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তায় হাঁটুউঁচু বরফ। দেখা গেল, এই বরফ ভেঙে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ডেভিড ল্যাংম্যান আসছেন। প্রথমে সবাই ভাবল চোখের ভুল। পরে দেখা গেল--না, চোখের ভুল নয়, আসলেই ডেভিড ল্যাংম্যান। সেই মানুষ, সেই আচার-আচরণ। বাঁ হাতের একটি আঙুল নেই। কপালে গভীর ক্ষতচিহ্ন, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে দিশেহারা ভাব। লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

তিনি বললেন, 'আমি ডেভিড ল্যাংম্যান।'

'তুমি কোথেকে এসেছ?'

'আসব আবার কোথা থেকে। আমি তো এখানেই ছিলাম। আমি আমার বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তোমার ছেলেমেয়েদের নাম কি?'

তিনি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের নাম বললেন। কাউন্টির শেরিফ তাঁকে গ্রেফতার করে হাজতখানায় রেখে দিল। খবর পেয়ে ডেভিড ল্যাংম্যানের স্ত্রী এল দেখতে। বিস্ময়ে তার বাকরোধ হল। ডেভিড ল্যাংম্যান বললেন, 'আমার কী হয়েছে বল তো, সব কেমন অচেনা লাগছে। এরা আমাকে হাজতে আটকে রেখেছে।'

'তুমি মারা যাও নি?'

'আমি মারা যাব কেন। এ-সব কী বলছ?'

'তুমি তো মারা গেছ। চার্চ ইয়ার্ডে তোমাকে গোর দেয়া হয়েছে।'

ডেভিড ল্যাংম্যানের স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। ডেভিড ল্যাংম্যানকে তাঁর স্ত্রী-পুত্ররা কেউ গ্রহণ করল না। শহরের সবাই তাঁকে বর্জন করল। তিনি একা একা থাকতেন। রাতে চার্চে ঘুমাতেন। শেষের দিকে তাঁর মাথারও গণ্ডগোল হল। সারাক্ষণ বিড়বিড় করে বলতেন, 'আমার কী হয়েছে? আমার কী হয়েছে?' তাঁর এই কষ্টের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দু' বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ডেভিড ল্যাংম্যান নামেই তাঁর কবর হয়।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য। কোনো রকম ব্যাখ্যা এর জন্যে দেয়া যায় না। এ-জাতীয় অবিশ্বাস্য ঘটনার নজির প্রাচীন উপকথায় প্রচুর আছে। উত্তর ভারতের উপকথায় মহারাজ উরনির কথা আছে, যাঁকে বলা হয়েছে 'দানসাগর'। মহারাজ উরনি শিকার করতে গিয়ে, গণ্ডারের শিংয়ের আঘাতে নিহত হন। রাজকীয় মর্যাদায় তাঁর দাহ সম্পন্ন করার পরপরই তিনি আবার বন থেকে ফিরে আসেন এবং রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তবে তাঁর চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়। তিনি ধর্মকর্ম দানধ্যানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাজভাণ্ডার দেখতে-দেখতে শূন্য হয়ে যায়।

এইজাতীয় রহস্যকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। আমরা ভান করি যে, এ-সব কখনো ঘটে নি। তা না-করে এই ধরনের ঘটনাগুলো নিয়ে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। যাতে প্রকৃতির বিপুল রহস্যের কিছু জট আমরা খোলার চেষ্টা করতে পারি।

মিসির আলি তাঁর এই লেখাটি পড়তে দিলেন তাঁর বন্ধু দেওয়ান সাহেবকে। দেওয়ান সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। পুরোপরি অ্যাকাডেমিক মানুষ।

পদার্থবিদ্যার সূত্রের মধ্যে যা পড়ে না, তা তিনি চোখ বন্ধ করে ঝুড়িতে ফেলে দেন।

দেওয়ান সাহেব মিসির আলির লেখা পড়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি বদ্ধ উন্মাদ।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'ধারণা অন্য রকম ছিল। লেখা পড়ে ধারণা পাল্টেছে। তুমি এক কাজ কর। ভালো এক জন ডাক্তারকে বল তোমার চিকিৎসা করতে।'

'আমার এই লেখাটাকে তোমার পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে?'

'হুঁ। পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র হচ্ছে, একই সময়ে একই স্থানে দুটি বস্তু থাকবে না। কারণ বস্তু স্থান দখল করে। আর তুমি অসীম বস্তু নিয়ে এসেছ, সবাইকে ঠেসে ধরছ এক জায়গায়।'

'মাত্রা কিন্তু ভিন্ন। এক-এক জীবন এক-এক ডাইমেনশনে প্রবাহিত।'

'মূর্খরা যখন পদার্থবিদ্যা কিছু না-জেনে কথা বলে, তখন এ-রকম কথা বলে। ডাইমেনশনের তুমি জান কী?'

'খুবই কম জানি। এইটুকু জানি যে, বস্তুর তিনটি মাত্রা : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা। সময়কে একটি মাত্রা ধরা হলে, হয় চারটি। এ ছাড়াও মাত্রা তিনের বেশি হয়। যেমন একটি বস্তুর কথা ধরা যাক, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান--একটি পারফেক্ট কিউব। এর মাত্রা হচ্ছে তিন। তবে চতুর্মাত্রিক কিউবও আছে, যার নাম খুব সম্ভব টেসারেক্ট। চতুর্মাত্রিক কিউব আমরা আঁকতে পারি না, তবে তার প্রজেকশন বা ছায়ার মডেল তৈরি করা হয়েছে।'

'মন্দ না। কিছু-কিছু তো জান বলেই মনে হচ্ছে।'

মিসির আলি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমরা বিজ্ঞানীরা একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে সব সময় ভোগ। সব সময় মনে কর--তোমরা ছাড়া অন্য কেউ বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে পারবে না।'

'রেগে যাচ্ছ কেন?'

'রাগছি না, বিরক্ত হচ্ছি। তোমাদের বিজ্ঞানে অসংখ্য গোঁজামিল। তোমরা তা ভালো করেই জান, অথচ ভান কর যে, এটা একটা নিখুঁত জিনিস।'

'গোঁজামিল তুমি কোথায় দেখলে?'

'থার্ড ডিনামিক্সের প্রথম সূত্রে তোমরা বল--শক্তি শূন্য থেকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। আবার এই তোমরাই বল যে, সৃষ্টির আদিতে শূন্য থেকে শক্তির সৃষ্টি।'

'সৃষ্টির আদি অবস্থা ছিল ভিন্ন।'

'প্রাকৃতিক সূত্রগুলো তাহলে কি একেক অবস্থায় একেক রকম হবে? তোমরাই তো তা অস্বীকার কর। তোমরাই তো বল, প্রাকৃতিক সূত্রের কোনো পরিবর্তন হয় নি, হবে না।'

দেওয়ান সাহেব গলার স্বর নরম করে বললেন, 'চা খাও।'

'তা খাব। তুমি আমার কথার জবাব দাও।'

'আছে। কিছু সমস্যা তো আছেই। প্রকৃতির ব্যাপারটায় রহস্য এত বেশি যে, কোনো থই পাওয়া যায় না। এবং সবচে' বড় মুশকিল কি জান? আমরা নিজেরাও এই

প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির অংশ হয়ে সেই প্রকৃতিকে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রকৃতির বাইরে যেতে হবে। তা যেহেতু পারছি না, প্রকৃতির অনেক রহস্যই বুঝতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'প্লেটোর সেই বিখ্যাত গুহার উপমাটা কি তুমি জান?'

'প্লেটো পড়ার সময় কোথায়? ফিজিক্স নিয়েই কূল পাচ্ছি না।'

'মনে কর--একটা গুহায় কিছু লোককে সারা জীবন বন্দি করে রাখা হয়েছে। লোকগুলো গুহামুখের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসা বলে, গুহার বাইরে কী হচ্ছে জানে না। তাদের যে-ছায়া পড়ছে গুহার দেয়ালে, তা-ই শুধু তারা দেখছে। তার বাইরে এদের কোনো জগৎ নেই। ছায়াজগৎই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। সত্যিকার জগৎ কী, এরা জানে না। আমাদের বেলাতেও তা-ই হতে পারে। আমরা যে-জগৎ দেখছি, এটা সম্ভবত ছায়াজগৎ। সত্যিকার জগৎ আছে আমাদের চোখের আড়ালে।'

'এ তো ফিলসফি—মায়াবাদ।'

'ফিলসফিতে অসুবিধা কোথায়?'

দেওয়ান সাহেব বললেন, 'তুমি আমাকে কনফিউজ করে দিচ্ছ। দেখি, একটা সিগারেট দাও।'

দেওয়ান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। তাঁকে চিন্তিত মনে হল। মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'তোমাকে আরো কনফিউজ করে দিচ্ছি। তোমাদের দলের এক জন লোক বিখ্যাত পদার্থবিদ শ্রোডিনজার নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবক্তাদের এক জন।

'ইরউইন শ্রোডিনজার?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন--

My body functions as a pure mechanism according to laws of nature and I know by direct experience that I am directing the motions. It follows that I am the one who directs the atoms of the world in motions. Hence I am God Almighty.

'এটা কি তোমার মুখস্থ ছিল?'

'না, ছিল না। তোমার কাছে আসার আগে মুখস্থ করেছি।'

'মনে হচ্ছে তৈরি হয়ে এসেছ।'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো। এখন বল আর কি বলবে?'

'তোমাকে একটা ছবি দেখাব। একটা বিয়ের ছবি। খুব মন দিয়ে ছবিটা দেখবে। এবং ছবিটার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব আছে কি না আমাকে বলবে।'

'দাও তোমার ছবি।'

মিসির আলি মুনির এবং বিনুর বিয়ের ছবিটি দিলেন। দেওয়ান সাহেব দীর্ঘ সময় ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তেমন কিছু তো দেখছি না।'

'মেয়েটা শাড়ি কিভাবে পরেছে সেটা দেখেছ?'

'অন্য সবাই যেভাবে পরে, সেভাবেই পরেছে।'

'না, তা না। মেয়েরা শাড়ির আঁচল রাখে বাঁ কাঁধে। এই ছবিতে প্রতিটি মেয়ে শাড়ির আঁচল রেখেছে ডান কাঁধে। বয়স্ক মহিলারাও তাই করেছেন।'

'তাতে হয়েছেটা কী?'

'ছবিটা কোনো এক বিশেষ কারণে উল্টো হয়ে গেছে। তোমার কি তা মনে হয় না?'

'হ্যাঁ, তা তো হয়েছেই। এটা অবশ্যই স্বাভাবিক ছবি নয়।'

মিসির আলি বললেন, 'নেচার পত্রিকায় একবার পড়েছিলাম, একটা ডান হা[illegible] গ্লাভস যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়, তবে সেই গ্লাভসটি হয়ে [illegible]বে বাঁ হাতের গ্লাভস। আমি কি ঠিক বললাম?'

'পুরোপুরি ঠিক না-হলেও ঠিক। ডান হাতের গ্লাভস বাঁ হাতের গ্লাভস হবে। রাইট হ্যাণ্ডেড অবজেক্ট হবে লেফট হ্যাণ্ডেড অবজেক্ট।

'এই ছবির মধ্যেও কি তাই হয় নি?'

দেওয়ান সাহেব আবার ছবিটি হাতে নিলেন। মিসির আলি বললেন, 'ছবিটি এসেছে অন্য মাত্রার এক জীবন থেকে। এই জন্যে ছবির এই পরিবর্তন।'

'তুমি খুব ছোট্ট জিনিস থেকে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চাইছ। এটা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয়?'

'না। ছবিটির আরো সহজ ব্যাখ্যা আছে। কোনো বিশেষ কারণে মহিলারা সেদিন ডান কাঁধে শাড়ির আঁচল দিয়েছিলেন। বাঁ কাঁধেই শাড়ির আঁচল রাখতে হবে, এ-রকম কোনো আইন তো জাতীয় পরিষদে পাস হয় নি।'

'তা হয় নি।'

'অন্য একটা ব্যাখ্যাও দেয়া যায়। এটা সম্ভবত খুব সহজ কোনো ক্যামেরা-ট্রিক।'

'ট্রিকটা তারা করবে কেন?'

'তোমার মতো পাগলদের উসকে দেবার জন্যে। দেখি, আরেকটা সিগারেট দাও, তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে আমিও পাগল হয়ে যাব। বিদেয় হও।'

'হচ্ছি।'

'শোন মিসির।'

'বল।'

'কাল-পরশু একবার এসো, তোমার থিওরিটা নিয়ে আলাপ করব।'

'আলাপ করবার মতো কিছু কি আছে?'

'না।'

'তা হলে আসতে বলছ কেন?'

'তোমার পাগলামি কথাবার্তা শুনতে ভালোই লাগে।'

মিসির আলি বললেন, 'তুমি আমার এই প্রশ্নটির জবাব দাও। যদি তিনটি লোক একটি ছাগলকে দেখতে পায়, তাহলে কি তুমি স্বীকার করবে ছাগলটির একটি অস্তিত্ব আছে? সে রিয়েল?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করব।'

'তিনটি মানুষ যদি একটি স্বপ্ন দেখে বা তিনটি মানুষ যদি একই চিন্তা করে, তাহলে সেই স্বপ্ন বা সেই চিন্তাকেও কি তুমি সত্য বলে স্বীকার করবে?'

'না। চিন্তা কোনো বাস্তব বিষয় নয়। এটা হচ্ছে মাথার মধ্যে কিছু বায়োকেমিক্যাল

রিঅ্যাকশন। তুমি কাল এসো। কাল তোমার সঙ্গে আলাপ করব।'

'সপ্তাহখানিক পরে আসব। এই এক সপ্তাহ আমি পড়াশোনা করব। কোথাও বেরুব না। প্রচুর বইপত্র জোগাড় করেছি। কূর্ট গডেল–এর সেই থিওরি বোঝবার চেষ্টা করব।'

'ভালো কথা, পড়। তবে খেয়াল রাখবে, অল্পবিদ্যার অনেক সমস্যা। নাপিত ফোঁড়া কাটতে পারে, সার্জেন চাকু হাতে নিতেও ভয় পায়।'

'চাকু হাতে নিতে হলে—তোমার কাছে আসব।'

'আরেকটা কথা—তোমার বিষয় সাইকোলজি, নিজেকে সেখানে আটকে রাখলে ভালো হয়। পদার্থবিদ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনাটা পদার্থবিদদের ওপর ছেড়ে দাও।'

মিসির আলি কঠিন একটা উত্তর দিতে গিয়েও দিলেন না। অ্যাকাডেমিক মানুষরা একচক্ষু হরিণের মতো হন। নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে পারেন না।

১৬

মুনির গত তিন দিন ধরে অফিসে আসছে না। আজ এক তারিখ। বেতনের ডেট। যারা অসুস্থ, তারাও এই দিনে উপস্থিত থাকে—বেতন নিয়ে চলে যায়। মুনির আজও এল না।

নিজাম সাহেব সত্যি–সত্যি চিন্তিত বোধ করলেন। আজ অফিসে আসবার পথে বিনু বলেছে, 'বাবা, ওঁকে নিয়ে আসবে? মুনির সাহেবকে।'

তিনি হ্যাঁ–সূচক মাথা নেড়েছেন। বাসায় মুনিরকে আনার তাঁর কোনো ইচ্ছে নেই, কিন্তু খোঁজ নিশ্চয়ই নেয়া যেতে পারে এবং নেয়া উচিতও। ছেলেটিকে তিনি সত্যি–সত্যি পছন্দ করেন।

অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে, তিনি সন্ধ্যার আগে আগে মুনিরের ঘরের দরজায় উঁকি দিলেন।

তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। একটা মরা মানুষ যেন বিছানায় পড়ে আছে। বড়–বড় করে শ্বাস নিচ্ছে।

'তোমার কী হয়েছে?'

'শরীরটা খুব খারাপ। রাতে–দিনে কখনো ঘুমাতে পারি না। ক্রমাগত নানান জায়গায় যাই।'

'তোমার কথা বুঝলাম না। নানান জায়গায় যাও মানে? কোথায় যাও?'

'না, যাই না কোথাও। শুয়ে থাকি।'

নিজাম সাহেব গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। অনেক জ্বর।

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'জ্বি না। ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'কী করে বুঝলে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না?'

'আমি জানি।'

'পাগলের মতো কথা বলবে না। তুমি সবজান্তা নাকি?'

'জ্বি, আমি সব কিছুই জানি।'

নিজাম সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কী অদ্ভুত কথাবার্তা! সত্যি সত্যি কি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। গায়ে আধময়লা একটা কাঁথা। ঘরে আলো নেই। অল্প যা আলো আসছে, তাতে মুনিরের মুখ অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে লাগছে। কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল চকচক করছে।

'বিনু কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।'

নিজাম সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই ছেলে এসব কী বলছে! বিনুকে তার দেখতে ইচ্ছে করবে কেন?

'ও আমার সঙ্গে শুধু কষ্টই করেছে। বেশির ভাগ সময়ই ওকে আমি কষ্ট দিয়েছি। এতে আমার মন–খারাপ লাগে। আমি শুধু কাঁদি। ওকে আপনি বলবেন।'

'তুমি এসব কী বলছ?'

'জ্বি?'

'এসব কী কথাবার্তা তুমি বলছ?'

'আমার ভুল হয়েছে। আর বলব না।'

'তুমি এক দিন মাত্র গিয়েছ আমার বাসায়। বিনুর সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয় থাকার কথা নয়।'

'জ্বি–না। আমার সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জট পাকিয়ে গেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না না, ঠিক আছে। ডাক্তার দেখানো দরকার। অবহেলা করা ঠিক হবে না। চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'তোমাকে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা। বিনুকে আপনি কি দয়া করে একটা কথা বলতে পারবেন?'

'কী কথা?'

'বলবেন যে, তার ধারণা ঠিক নয়। আমি তার ওপর কোনো অবিচার করি নি।'

'আমি বলব। তুমি ঘুমাবার চেষ্টা কর।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মুনির সঙ্গে–সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর গাঢ় ঘুম। নিজাম সাহেব দীর্ঘ সময় তার পাশে রইলেন। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে এলেন। তারা এক জন ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তার বলেছে--প্রেসার বেশ হাই। কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে। নিজাম সাহেব এক জন ডাক্তার নিয়ে এলেন। সেই ডাক্তার অনেক ডাকাডাকি করেও মুনিরের ঘুম ভাঙাতে পারলেন না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলে জ্বি বলে সাড়া দেয়, তারপর আর কোনো উত্তর করে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ইনি কি আপনার আত্মীয়?'

'জ্বি না। তবে আত্মীয়ের মতোই। ছেলেটিকে খুব স্নেহ করি। আমার অফিসেই কাজ করে।'

'ড্রাগস খায় কি না জানেন?'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

'চোখের মণি খুব ছোট। আলো ফেললেও তেমন রেসপন্স করছে না। ড্রাগ এডিক্টদের এরকম হয়। ড্রাগস নেয় কি না আপনি জানেন না?'

'জ্বি–না।'

'মনে হচ্ছে নেয়। ড্রাগসটা অসম্ভব বেড়ে গেছে। এটা খুব অল্প দিনেই বিরাট সামাজিক সমস্যা হিসেবে আসবে। আপনি বরং একে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন। দেরি করবেন না। হাসপাতালে চেনা–জানা কেউ আছে?'

'জ্বি–না।'

'হাসপাতালে ভর্তি করাটাও তো তাহলে এক সমস্যা হবে।'

নিজাম সাহেব অসাধ্য সাধন করলেন। রাত ন'টার মধ্যে মুনিরকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ফেললেন। এক জন অল্পবয়স্ক ডাক্তারের হাত ধরে সত্যি–সত্যি কেঁদে ফেললেন।

'একটু দেখবেন ভাই। ছেলেটার কেউ নেই।'

'দেখব, নিশ্চয়ই দেখব।'

'খুবই দরিদ্র ছেলে।'

'ধনীর যে–চিকিৎসা হবে, দরিদ্রেরও সেই একই চিকিৎসা হবে।'

'ভাই, তা তো হয় না।'

'হয়। আপনারা জানেন না। আমরা ইন্টার্নি ডাক্তার। হাসপাতাল আমরাই চালাই। ধনী–দরিদ্র নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। যখন বয়স্ক হব, প্রফেসর–ট্রফেসর হব, তখন হয়তো ঘামাব। এখনো আদর্শ বলে একটা ব্যাপার সামনে আছে।'

নিজাম সাহেব ডাক্তার ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাড়ি ফিরতে–ফিরতে তাঁর এগারটা বেজে গেল। উদ্বিগ্ন মুখে বিনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার বাবা কখনো এত দেরি করেন না। আজ কেন করছেন? অ্যাকসিডেন্ট হয় নি তো? বারবার বিনুর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। বাবাকে দেখে সে সত্যি–সত্যি কেঁদে ফেলল, 'কোথায় ছিলে তুমি?'

'মুনিরের খোঁজে গিয়েছিলাম।'

'আমি এদিকে ভয়ে অস্থির। ওঁকে পেয়েছিলে?'

নিজাম সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'না।'

বিনু দীর্ঘ সময় বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল, 'মিথ্যা কথা বলছ কেন বাবা?'

নিজাম সাহেব মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'বাবা, উনি কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছেন?'

'হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'কী অসুখ?'

'বুঝতে পারছি না। কী সব আবোল–তাবোল কথা বলছে।'

'আমার এখানে যখন এসেছিলেন, তখনো আবোল-তাবোল কথা বলেছিলেন। আমি খুব রাগ করেছিলাম।'

নিজাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কই, তুই তো আমাকে বলিস নি?'

'উনি যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছেন, এটাও তো তুমি আমাকে বল নি।' নিজাম সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কী বলবেন, বুঝতে পারলেন না।

'বাবা।'

'কি?'

'তুমি আমাকে একবার ওঁর কাছে নিয়ে যাবে?'

নিজাম সাহেব চুপ করে রইলেন। বিনু বলল, 'আমি তাঁকে খুব কড়া-কড়া কথা বলেছি। আমার খারাপ লাগছে। হাত মুখ ধুয়ে এস, ভাত দিচ্ছি।'

নিজাম সাহেব ক্ষুধার্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো খাবারই মুখে রুচল না। বারবার মনে হতে লাগল, বিনুর বিয়ে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না তো? সে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে না তো? গায়ে-হলুদের আর মাত্র পাঁচ দিন আছে। আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করবে। একটা কেলেঙ্কারি হবে না তো?

সারা রাত বিনু এক ফোঁটা ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রইল। তার কাছে সব কিছুই কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে। একটা জটিল রহস্যের আবর্তে সে পড়ে গেছে, এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই। বারান্দা অন্ধকার। অনেক দূরে একটা স্ট্রীটল্যাম্প জ্বলছে। তার আলো যেন চারপাশের অন্ধকারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

১৭

মিসির আলির কাছে একটি চিঠি এসেছে।

এই কারণে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। চিঠি না-খুলেই তিনি একপাশে ফেলে রেখেছেন। এখন বিরক্তি কমানোর চেষ্টায় সুন্দর কিছু কল্পনা করার চেষ্টা করছেন। সুন্দর কোনো কল্পনাও মাথায় আসছে না।

তাঁর বিরক্তির মূল কারণ হচ্ছে, জটিল একটি বিষয় নিয়ে তিনি ভাবছিলেন। পিয়ন ঠিক এই সময় চিঠি নিয়ে এল। এবং এমনভাবে কড়া নাড়তে লাগল, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে--এক্ষুণি সবাইকে ঘর থেকে বের করতে হবে। তিনি দরজা খুলে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'স্যার, একটি চিঠি।'

'রেজিস্ট্রি চিঠি?'

'জ্বি-না।'

'তাহলে এত হৈচৈ করছেন কেন? দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।

মিসির আলি আবার তাঁর চিন্তায় ফিরে যেতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবছিলেন,

মানু । সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে। ঈশ্বরের কল্পনাই তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হয়, তবু তিনি ধরে নিলেন : এক জন ঈশ্বর আছেন--যিনি অসীমকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও অসীমকে ধারণ করতে পারে। সে তা ধারণ করে মস্তিষ্কে। তার কল্পনা অসীম, তার চিন্তা অসীম।

ধর্মগ্রন্থগুলোও বারবার মানুষকে ঈশ্বর বলেছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে--

Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them : The God has sent me to you and they ask me, what is his name? What shall I say to them? God said to Moses: I AM WHO I AM. And he said say : this to the people of Israel: I AM has sent me to you.

এই অংশটির মানে কি? মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নাম হচ্ছে--আমি। ইসলাম ধর্মেও একই ব্যাপার। আল্লাহ্ বলেন--মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে ফুৎকার করেছেন। এক পয়গাম্বরের কাহিনী আছে, যিনি ঘোষণা করলেন, 'আনাল হক'--আমিই আল্লাহ্। হিন্দু ধর্মে মানুষকে বলা হয়েছে--নর-নারায়ণ।

মানুষ যদি ঈশ্বর হয়, তাহলে সর্বজগতের ওপর তার আধিপত্য থাকবে। মুনিরের কথাই ধরা যাক। তার কথামতো যদি অসংখ্য জীবন মানুষের থাকে এবং সে যদি ঈশ্বর হয়, তাহলে প্রতিটি জীবন সম্পর্কেই সে জানবে।

কিন্তু তা সে জানে না। কেন জানে না? মানুষের যে অংশ অসীমকে ধারণ করে অর্থাৎ মস্তিষ্কের সেই অংশ পুরোপুরি কাজ করে না বলেই সে জানে না। মানুষ যে তার মস্তিষ্কের অংশমাত্র ব্যবহার করে, এটা তো আজ বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত সত্য। মস্তিষ্কের একটি বিশাল অংশের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা নেই। কারণ সেই অংশটি সুপ্ত।

কারো-কারো ক্ষেত্রে সুপ্ত অংশ কিছুটা জেগে ওঠে। তার চারপাশের অসীম জগৎ সম্পর্কে সে কিছুটা ধারণা পেতে থাকে। যেমন মুনির পাচ্ছে।

থিওরি হিসেবে এটা কেমন? মোটেই সুবিধের নয়। মিসির আলি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। একটি থিওরি দাঁড় করাতে ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নেয়াটাই তাঁর অপছন্দ। যে কোনো থিওরি বা হাইপোথিসিস দাঁড়ায় লজিকের ওপর--অন্য কোনো কিছুর ওপরে নয়। ধর্মগ্রন্থের ওপরে তো নয়ই।

মিসির আলির বিরক্তি আরো বাড়ল। মুনিরের সমস্যাটিকে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। নিজের ওপরই কেমন যেন রাগ হচ্ছে।

তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খাম খুলে চিঠি বের করলেন। সেখানে লেখা--

স্যার,

আমি খুব অসুস্থ। আমাকে কি আপনি দেখতে আসবেন?

আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি পিজিতে। ওয়ার্ড নম্বর তিন শ' ছয়।

টুনু

এই টুনু যে মুনির, এটা ধরতেও তাঁর অনেক সময় লাগল। অনেক দিন থেকেই

তিনি মুনিরের খবর রাখেন না। নিজের পড়াশোনা এবং চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। মুনিরও যে তাঁর কাছে আসছে না, এটা তিনি লক্ষ করেন নি। কোনো-একটা কাজ নিয়ে ডুবে থাকলে তাঁর এ-রকম হয়।

নিজের ওপর তাঁর বিরক্তি লাগছে। দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। তিনি দরজার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'এস নীলু।'

নীলু হালকা গলায় বলল, 'আমি আসায় কি আপনি বিরক্ত হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছি। এখন এক জায়গায় যাচ্ছি। তুমি আসায় আটকা পড়লাম।'

'আমি আপনাকে আটকাবার জন্যে আসি নি। যেখানে যাচ্ছেন যান।'

'তুমি তাহলে অপেক্ষা কর--আমি চট করে কাপড় বদলে আসি। তোমার হাতে কি?'

'চা-পাতা। খুব ভালো চা। সিলেটে আমার এক মামা আছেন। চা বাগানে কাজ করেন। তিনি পাঠিয়েছেন।'

'থ্যাঙ্কস্।'

'আপনি কাপড় বদলাতে-বদলাতে কি আমি চট করে আপনার জন্যে এক কাপ চা বানাব?'

'না, দেরি হয়ে যাবে।'

মিসির আলি তৈরি হয়ে বেরুতে যাবার সময় নীলু বলল, 'আমি এখানে থাকব, আপনি ঘুরে আসুন।'

'তুমি এখানে থাকবে মানে?'

'আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আমি কখন ফিরব, তার কি কোনো ঠিক আছে?'

'যত দেরিই হোক অপেক্ষা করব।'

'একা-একা?'

'হ্যাঁ, একা-একা। আপনি একা-একা থাকতে পারলে আমি পারব না কেন?'

মিসির আলি কথা বাড়ালেন না, হাসপাতালের দিকে রওনা হলেন।

মুনিরকে দেখে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। এ কী অবস্থা! এত দ্রুত এক জন মানুষের শরীর এত খারাপ হয় কীভাবে? জীবিত কোনো মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

মুনিরের বেডের পাশে এক জন ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ইশারায় মিসির আলিকে কথা বলতে নিষেধ করলেন, বারান্দায় যেতে বললেন।

মিসির আলি বললেন, 'এই অবস্থা হল কীভাবে? 'ডাক্তার সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি না।'

'হয়েছেটা কী?'

'তাও তো জানা যাচ্ছে না। ড্রাগ এডিক্ট বলে গোড়ায় সন্দেহ হচ্ছিল, এখন তা মনে হচ্ছে না। ব্রেইনে কিছু বাড়তি ব্যাপার আছে। টিউমারজাতীয় কিছু হতে পারে।'

'বলেন কী!'

'নিউরোলজিষ্ট সোবাহান সাহেব ভালো বলতে পারবেন। উনিই দেখছেন। আপনি বরং ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।'

'উনি কি আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন।'

সোবাহান সাহেব বললেন, 'ওপেন না করে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে টিউমারের ব্যাপারটা হতে পারে। স্নায়ুর সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগের জায়গায় টিউমার ডেভেলপ করছে বলে মনে হচ্ছে। সিমটম মিলে যাচ্ছে।'

'যদি টিউমার হয়, তাহলে কী হবে?'

'খুবই ফেটাল হবে। অবস্থা দ্রুত খারাপ হবে। হচ্ছেও তাই। পেশেন্টের হেলুসিনেশন হচ্ছে। বলল আমাকে--বাবা-মা এদের নাকি দেখতে পাচ্ছে। আপনি এই পেশেন্টের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। আমার মনে হয় না, আমাদের খুব একটা কিছু করার আছে। একটা যা পারি সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। তার প্রয়োজন হচ্ছে না। রোগী ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে। দিন-রাত ঘুমুচ্ছে। এটাও এক দিক দিয়ে ভালো।'

মিসির আলি রোগীর কাছে ফিরে এলেন। মুনিরের ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুনিরের ঘুম খুব প্রশান্ত নয় বলে তাঁর ধারণা হল। ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করছে। দ্রুত চোখের পাতা পড়ছে। REM(Rapid eye movement)— তার মানে স্বপ্ন দেখছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জগতে। কার সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে, সে কী বলছে কে জানে?

'মুনির, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?'

'পারছি।'

'আমি কে বল তো?'

'আপনি মিসির আলি।'

'এই তো পারছ--গুড বয়। তোমার যে এই অবস্থা, তা তো জানতাম না। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

মুনির উঠে বসতে চেষ্টা করল। মিসির আলি তাকে আবার শুইয়ে দিলেন।

'কী হয়েছে তোমার?'

মুনির ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। জেনারেল ওয়ার্ডে অসংখ্য রোগী। এর মধ্যে এক জন মারা গেছে, তাকে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড়। ফিনাইলের গন্ধ ছাড়িয়ে বিকট এক ধরনের গন্ধ আসছে, যে-গন্ধে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে যায়। মিসির আলি বললেন, 'এখানে বেশি দিন থাকলে তো সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবে!'

মুনির চাপা গলায় বলল, 'বেশিক্ষণ তো এখানে থাকি না। অন্য জীবনগুলোতে ঘুরে বেড়াই। এখন আর আমার আসতে ইচ্ছে করে না। খুব কম আসি। এই যে এসেছি, আমার ভালো লাগছে না। চলে যেতে ইচ্ছে করছে। এখানে যতক্ষণ থাকি প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়।'

'এখন হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'খুব বেশি?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি। আমার কী হচ্ছে বলুন তো? অন্য যে-সব জীবনের কথা বলি, সে-সব কি সত্যি, না সবই স্বপ্ন?'

'বুঝতে পারছি না।'

www.Murchona.com

'অন্য যে–জগতে আমি যাই, সেখানেও আপনার মতো এক জন আছেন। তাঁকেও আমি আমার সমস্যার কথা বলেছি।'

'তিনি কী বললেন?'

'তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথ খুঁজছেন।'

'পেয়েছেন কোনো পথ?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞাপন দেবেন। জগৎগুলো মোটামুটি একই রকম, কাজেই দু' জগতের পত্রিকাগুলোও একই রকম হবে। ঐ জগতের পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, এ জগতের পত্রিকাতেও প্রায় কাছাকাছি ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। ঐ বিজ্ঞাপনই হবে যোগসূত্র। বুঝতে পারছেন কিছু?'

'পারছি। উনি কি বিজ্ঞাপন ছাপতে দিয়েছেন?'

'এখনো না। ভাষা কী হবে তাই নিয়ে ভাবছেন। ভাষাটা তিনি এমন করতে চান, যাতে দেখামাত্রই আপনি বুঝতে পারেন। স্যার, আমি আর থাকতে পারছি না, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'খুব বেশি যন্ত্রণা?'

'হ্যাঁ, খুব। আমি আর পারছি না। আপনি কি একটা কাজ করবেন?'

'বল, কী কাজ?'

'বিনুকে একটু নিয়ে আসবেন? বিনু যদি আমার পাশে এসে বসে, যদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তাহলে আমার যন্ত্রণাটা কমবে।'

'তোমার এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'আমার মাথার যন্ত্রণাটা শুধু এই জগতেই হয় না। সব ক'টা জগতে হয়। বিনু তখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তখন যন্ত্রণাটা কমে।'

'তুমি অতীতে যেতে পার বলে মনে হয়। অন্য জীবনের ছোটবেলার কথা তুমি বল। ভবিষ্যতে কি যেতে পার?'

'না, পারি না। সব ক'টা জীবনে দেখেছি, একটা সময়ে আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। ঐ সময়টাতে আমি যাই না।'

'তুমি কি ইচ্ছামতো যেখানে যেতে চাও যেতে পার?'

'না, পারি না। হঠাৎ জীবনের একটা সময়ে এসে উপস্থিত হই। সেটা পছন্দ না–হলে অন্য কোথাও যাই। স্যার, আপনি বিনুকে খবর দেবেন?'

'দেব।'

বিনুকে তিনি খবর দিতে পারলেন না। সেদিন তার গায়ে হলুদ হচ্ছে। বাড়িতে আনন্দ এবং উল্লাস। বিনুর জীবন নতুন একটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাকে বাধা দেওয়ার কোনো কারণ মিসির আলি দাঁড় করাতে পারলেন না। হয়তো বিনুরও অসংখ্য জীবন আছে, হয়তো নেই। হয়তো এই একটিই তার জীবন। এই জীবনটি জটিলতামুক্ত হোক-–মিসির আলি মনে–মনে এই কামনাই করলেন।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন অনেক রাতে। দরজা তালাবদ্ধ। নীলু দরজা বন্ধ করে চলে গিয়েছে। তালা ভেঙে ঢুকতে হল। ঘর পরিপাটি করে গোছান। নীলু এর মধ্যে রান্না

করেছে। খাবারদাবার গুছিয়ে রেখেছে টেবিলে।

নীলু একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছে। '--মানুষের একটাই জীবন, নাকি অসংখ্য জীবন--তা আমি জানি না। এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। আমি জানি, আমার একটাই জীবন। আপনাকে কিছুতেই তা নষ্ট করতে দেব না।'

সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা। অনেক সময় নিয়ে সে লিখেছে এবং হয়তো-বা লিখতে মেয়েটির চোখ ভিজে উঠেছে। নীলু কখনো কাঁদে না, সেই জন্যেই বোধ হয় অতি অল্পতে তার চোখ ভিজে ওঠে।

১৮

মুনির মারা গেল শ্রাবণ মাসের কুড়ি তারিখে।

দিন-তারিখ মিসির আলির মনে থাকে না। এই তারিখটা মনে আছে, কারণ এর দু' দিন পরই ছিল ২২শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন।

মৃত্যুর আগে-আগে মুনির বেশ সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ করছিল। রসিকতা করছিল। তবে মিসির আলি বুঝতে পারছিলেন যে, সে যে-কোনো কারণেই হোক প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।

মিসির আলি তার হাত ধরে বসে ছিলেন। মুনির এক সময় বলল, 'বোধহয় মারা যাচ্ছি, তাই না?'

মিসির আলি জবাব দিলেন না। মুনির বলল, 'আপনি একবার বলেছিলেন, মানুষই ঈশ্বর, তাহলে মৃত্যুকে আমরা জয় করতে পারি না কেন?'

'হয়তো পারি।'

'হ্যাঁ, হয়তো পারি!'

'তোমার কি মরতে ভয় লাগছে?'

'লাগছে।'

'তোমার তো ভয় লাগা উচিত নয়। তুমি তো অসংখ্য জীবনের কথা বল। এই জীবন গেলে কী হবে, তোমার তো আরো অযুত নিযুত লক্ষ কোটি জীবন আছে।'

'এখন মনে হচ্ছে, সবই আমার কল্পনা। স্যার, আপনি আমার মাথায় হাত রাখুন।'

মিসির আলি পরম মমতায় তাঁর হাত রাখলেন মুনিরের মাথায়। তাঁর চোখ ভিজে উঠছে। তিনি তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। জানালার ওপাশে আলো-আঁধারের কী এক অপূর্ব রহস্যময় জগৎ!

মিসির আলি বিড়বিড় করে বললেন—

You promise heavens free from strife,
Pure truth and perfect change of will;
But sweet, sweet is this human life,
So sweet, I fain would breathe it still,
Your chilly stars I can forgo,
This warm kind world is all I know.

www.Murchona.com

Nishad by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com